ইউনিট-৫

বাংলাদেশে শিক্ষার সাম্প্রতিক ভূমিকা

অধিবেশন-১ : শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য

অধিবেশন-২ : অন্তর্নিহিত দার্শনিক চিন্তার প্রভাব

অধিবেশন-৩ : লক্ষ্য অর্জনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষকগণের বাঁধা/ প্রতিবন্ধকতাসমূহ

অধিবেশন-৪ : পরিবর্তনশীল সমাজে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা

অধিবেশন-৫ : গণশিক্ষায় ভূমিকা

অধিবেশন-৬ : সমাজ বিকাশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা

ইউনিট-৫ অধিবেশন-১

শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য

ভূমিকা

যে কোন জাতির আশা-আকাঙক্ষার বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যত সমাজ গঠনের প্রধান হাতিয়ার হলো সেই জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা। এই বিষয়টি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাজেই বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর নানা সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং বাঞ্ছিত সমাজ গঠনের প্রেরণা দান করাই বাংলাদেশের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতকে ভিত্তিমূল হিসাবে ধরেই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- আঞ্চলিক দেশসমূহের লক্ষ্যের সাথে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্যের তুলনা করতে পারবেন।
- জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষানীতি নির্ধারণের লক্ষে যে সব শিক্ষা কমিশন বা শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিল প্রত্যেকটি কমিশন বা কমিটি বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে তা নির্ধারণ করে তাদের শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষ অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন (২০০৪) পূর্ববর্তী কমিশন বা কমিটির শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, মূল শিখনীয় বিষয়-এ উল্লিখিত শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ক অংশটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং আপনার মতে কোন লক্ষ্যগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো 'কী (key) পয়েন্ট'-এর মাধ্যমে নিম্নের ছকে লিখুন।

বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য

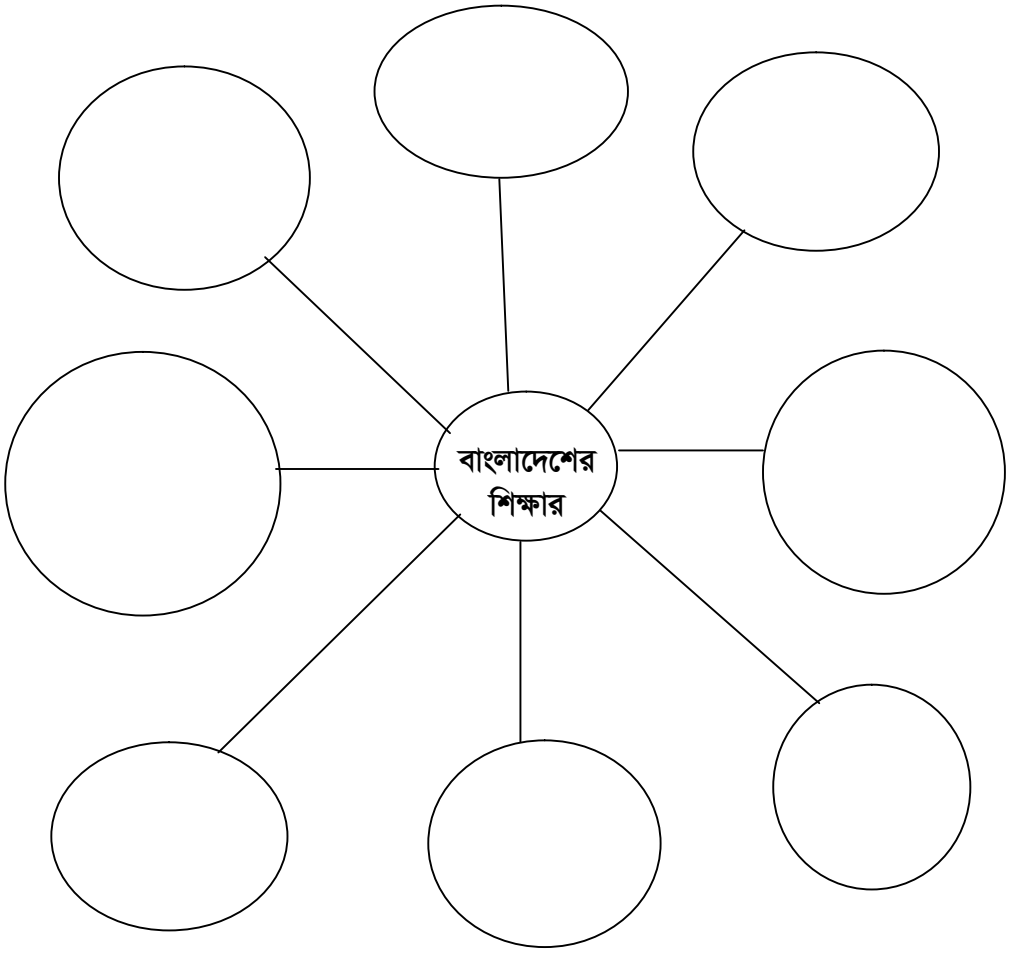

পর্ব-খঃ আঞ্চলিক দেশসমূহের শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য-এর তুলনাকরণ

আঞ্চলিক দেশসমূহের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা উন্নয়নে ভারত ও জাপান অগ্রগামী হিসাবে চিহ্নিত। এ দুটি দেশের সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে ঐদুটি দেশের শিক্ষার লক্ষ্য একটি বিশেষ প্রত্যয় হিসাবে বিবেচিত। কাজেই বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে ভারত ও জাপানের শিক্ষার লক্ষ্যের তুলনামূলক আলোচনা বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার মূল শিখনীয় বিষয়-এ উপস্থাপিত ভারত ও জাপানের শিক্ষার লক্ষ্য অংশটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং কোন দেশের কোন শিক্ষার লক্ষ্যটি বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে মিল রয়েছে তা নিম্নের ছকে লিখুন।

ক্রমিক নং	দেশের নাম	বাংলাদেশের লক্ষ্যের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন লক্ষ্য
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		

পর্ব-গঃ জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, বাংলাদেশের শিক্ষার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তা নিম্নের ছকে প্রত্যেকটি ৫টি বাক্যে লিখুন।

বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য	বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পদ্ধতি
১.	১.
	২.
	৩.
	৪.
	৫.
২.	১.
	২.
	৩.
	৪.
	৫.

ইউনিট-৫ অধিবেশন-১

মূল শিখনীয় বিষয়

জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষা হল ব্যক্তির শারীরিক, সমাজমূলক, মানসিক ও ব্যক্তিগত প্রভৃতি সকল দিকের সর্বাঙ্গীন বিকাশের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াবিশেষ। শিক্ষা জীবনের জন্য, জীবনে শিক্ষার স্থান সর্বাগ্রে। মনীষী টলষ্টয়ের শিক্ষাদর্শনের সার কথা- শিক্ষা মানে সম্পূর্ণ জীবনের সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে দেখেছেন ব্যাপক অর্থে-প্রকৃত শিক্ষা বিকাশ সাধনও বটে, যা মানুষের সামগ্রিক সত্তার বিকাশ ঘটায় তাই হল সুশিক্ষা। আর এই সুশিক্ষার লক্ষণ হল- "তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে" তাঁর শিক্ষা হল এমন শিক্ষা যার প্রকৃত লক্ষ্য মানুষকে সত্যের সন্ধান দেওয়া "আমাদের শিক্ষার মধ্যে এখন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়"। শিক্ষা সম্পর্কে অন্য একটি ধারণা হচ্ছে- "শিক্ষা শিক্ষার জন্য। অর্থাৎ শিক্ষার অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে, শিক্ষা বুদ্ধি চর্চার নামান্তর।

বাংলাদেশে জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে হলে জনগণকে উপযুক্ত শিক্ষার শিক্ষিত করা দরকার যাতে জনগণ দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সত্যিকার জনসম্পদে পরিণত হতে পারে। সুনাগরিক সৃষ্টিতে এবং প্রগতিশীল সমাজ জীবনে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন স্তর ও বিষয়ভেদে বিভিন্ন ভাবে থাকে। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে চিন্তা ও ভাবধারার বৈষম্যের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন রূপধারণ করেছে। তবে শিক্ষার একটি সার্বজনীন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে, সেটা কোন স্তরের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, সকল স্তরের জন্যই তা প্রযোজ্য।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করতে যেয়ে প্রথমেই জানা দরকার লক্ষ্য বলতে কী বুঝায়? লক্ষ্য হল গন্তব্যস্থল যা জ্ঞান, দক্ষতা, উপলব্ধি ও মূল্যবোধের সমন্বিত উদ্দিষ্ট।

আর উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছানোর পথে অন্তবর্তী কাঙ্ক্ষিত অর্জনসমূহের বিবরণ। উদ্দেশ্য হতে হবে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও সহজবোধ্য শব্দ ও বাক্যের সাহায্য প্রণীত আচরণের সাথে সম্পর্কিত, অর্জনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য।

আঠার শতকে রুশো বলেছেন, "সকল কৃত্রিমতা বিসর্জন দিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী শিশুর শক্তি- সামর্থের সর্বাঙ্গীন স্বাভাবিক বিকাশ হবে শিক্ষার লক্ষ্য"।

আমাদের দেশে শিক্ষা সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সময়ে যে সব শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল তারাই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন।

স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৪ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেন। এর পর আরও দুইটি শিক্ষা কমিশন ও একটি শিক্ষানীতি কমিটি গঠিত হয়েছে। এগুলো হল-

১। অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমেদ শিক্ষা কমিশন-১৯৮৮।
২। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-২০০০, প্রফেসর মোঃ শামসুল হক ছিলেন এর প্রধান।
৩। প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন-২০০৪।

প্রত্যেকটি শিক্ষা কমিশন শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যসমূহ নিয়ে গঠনমূলক মন্তব্য করেছেন। বিভিন্ন কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতকে ভিত্তি হিসাবে ধরেছেন।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হয়। আর দেশের উন্নয়নও সেসব নীতির ওপর নির্ভরশীল। যেকোন দেশে যেসব শিক্ষানীতি প্রণীত হয় তা সেদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে। আবার এ শিক্ষানীতির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো নিম্নরূপঃ

ক. জাতীয়তাবাদ
খ. সমাজতন্ত্র (সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারে)
গ. গণতন্ত্র
ঘ. মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

এসব মূলনীতি থেকে উদ্ভূত আরও কিছু উপমূলনীতি রয়েছে। যেমন:

ক) দেশের অনগ্রসর মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত
খ) শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ
গ) জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার উন্নতি
ঘ) সুযোগের সমতা বিধান
ঙ) কর্মের অধিকার প্রদান
চ) জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা
ছ) আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন
জ) গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি

শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাংখা রূপায়ণ ও ভবিষ্যত সমাজ গঠনের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং বাঞ্ছিত নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য।

ক. দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্বঃ প্রত্যেক নাগরিকের নিজের দেশকে অবশ্যই ভালবাসা উচিত। এ ভালবাসা বা দেশপ্রেম বলতে কোন সুস্পষ্ট ভাবাবেগপূর্ণ অনুভূতির কথা বোঝায় না, বাংলাদেশের আদর্শের যথার্থ উপলব্ধির কথাই বোঝায়। দেশপ্রেমের মূল মর্ম হচ্ছে, প্রত্যেক নাগরিক জাতীয় সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এবং জনগণের সমষ্টিগত আশা-আকাংখার সাথে একাত্ম হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক যেন জাতীয় আদর্শ, আশা-আকাংখা ও ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং মাতৃভূমি ও জনগণের কল্যাণ চেতনায় দেশপ্রেমিক নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে।

খ. জাতীয়তাবাদ ঃ জাতির গর্ব, একতা ও আশা-আকাংখার প্রতীক বাংলাভাষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হবে। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যাতে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধ সংহত এবং প্রসারিত হয়। আর তাই গোষ্ঠী চেতনার উর্ধ্বে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধ সুনিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত সবার জন্য একই শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা উচিত।

গ. সমাজতন্ত্র ঃ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। সেজন্য সমাজের চেতনা জগতেও আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জনগণের মনে সেই সচেতনতা প্রতিষ্ঠিত করা শিক্ষানীতির লক্ষ্য বলে স্থির করতে হবে।

ঘ. গণতন্ত্র ঃ গণতন্ত্রে সমাজের সবার অধিকার ও কর্তব্য সমান, যা সর্বজন স্বীকৃত। মৌলিক মানবাধিকারের স্বরূপ, স্বাধীনতার সঠিক অর্থ, মানব সত্তার মর্যাদাবোধ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কীভাবে নির্ধারিত হয়, তার সুস্পষ্ট ধারণার শিক্ষার্থীর মনে থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

ঙ. ধর্মীয় সহনশীলতা ঃ রাষ্ট্রের ধর্মীয় নীতি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করে। এ নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুসমন্নিত মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা করাই হবে শিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

চ. মানবতা ও বিশ্ব নাগরিকত্ব ঃ জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে শোষণহীন নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সকল সংগ্রামী জনগণের প্রতি বন্ধুত্ব ও একতার হস্ত প্রসারিত করতে হবে। মানুষে মানুষে মৈত্রী , সৌহার্দ ও প্রীতি এবং মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

ছ. নৈতিক মূল্যবোধ ঃ শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর মনে মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে যেন সে সর্বদা সত্যের পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়, সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে।

জ. সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষা ঃ দীর্ঘ দিনের শোষণ জর্জরিত সমাজের দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে বিশেষ হাতিয়ার রূপে প্রয়োগ করতে হবে। সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধানপূর্বক জাতীয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার

সুনিশ্চিত করতে হবে, যাতে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি স্তরে সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে।

ঝ. জাতীয় অর্থনীতির অনুকূল প্রয়োগমুখী শিক্ষা ঃ দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির মহান দায়িত্ব শিক্ষাব্যবস্থার। আমাদের সম্পদ সীমিত হলেও বিপুল জনশক্তি রয়েছে যা কর্মে নিয়োজিত হলে এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী বিভিন্নমুখী দক্ষতা অর্জন করলে অনিবার্যভাবে জাতীয় সম্পদ সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু জনশক্তিকে কর্মে নিয়োগের শিক্ষা ও উপযুক্ত দক্ষতা দানের সেই ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনায়।

ঞ. শ্রমে মর্যাদাবোধঃ জাতি হিসেবে আমাদের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে হাতের কাজের প্রতি অনীহা ও শ্রমের মর্যাদাদানে দ্বিধাবোধ। এ ধরনের মানসিকতা বিদ্যমান থাকলে দেশের গঠনমূলক উন্নয়নকর্ম মন্থর গতি হতে বাধ্য।

ট. কুশলী জনসম্পদ সৃষ্টি ঃ কুশলী জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগমুখী মানসিক শ্রমের সাথে উৎপাদনমুখী কায়িক শ্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে। আর কৃষি, বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে হবে।

ঠ. নেতৃত্বে ও সংগঠনের গুণাবলী, সৃজনশীলতা ও গবেষণাঃ নতুন সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু তথ্য আহরণ নয়-উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা ও স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা থাকবে।

বাংলাদেশে ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের সাথে সাথে শিক্ষাকে সমকালীন বিশ্বের জ্ঞান প্রবাহের তুল্যমানে উন্নতি করতে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক ও গুণগত পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে

গ্রহণ করে এবং কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও শিক্ষানীতি প্রণয়নকালে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীীত ও ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের মজিফউদ্দিন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশও কমিটি পর্যালোচনা করেছে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ

১) ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
২) বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ত ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।
৩) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তাচেতনায় দেশাত্ববোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।
৪) দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম ও সৃজনশীল এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।
৫) কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
৬) বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ সৃষ্টি এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
৭) গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।
৮) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।
৯) জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।
১০) দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
১১) বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ সুবিধার অবারিত করা।
১২) শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করা।
১৩) শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।
১৪) পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ভারতের শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কোঠারি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। ১৭টি দফার এ ঘোষণার মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে তাহলঃ

১) সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি কার্যকর করা।

২) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে নির্বিশেষে শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩) নারী শিক্ষা, সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রচলন করা (বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষকদের জন্য)।

৪) জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতি বিকাশ সাধনে তিন-ভাষা সূত্রের প্রয়োগ করা। অর্থাৎ স্কুল স্তরের শিক্ষায় অহিন্দী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে-মাতৃভাষা, ইংরেজি ও হিন্দী এবং হিন্দী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে-হিন্দী, ইংরেজি এবং অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (সম্ভব হলে একটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা)।

৫) কল্যাণমূলক ও কর্ম অভিজ্ঞতায় বাধ্যতামূলকভাবে সব শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা।

৬) শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপযুক্ত বেতন, সামাজিক সম্মান ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

৭) অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার জন্য বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮) শিক্ষার জন্য ক্রমপর্যায়ে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করা।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী উপর্যুক্ত জাতীয় শিক্ষানীতির ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে Challenge of Education-A Policy perspective ঘোষণায় যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবৃত করে তা নিম্নরূপ:

১) মেধা ও মননের সব ক্ষেত্রে নবতর জ্ঞানের বিকাশ সাধন।
২) উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিরাজিত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ সাধন।
৩) ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর উপলব্ধি বিকাশে সহায়তাকরণ।
৪) ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক স্বাচ্ছন্দ, যোগ্যতা ও সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে-
   ক. ব্যক্তিত্বের দৈহিক, মানসিক ও নান্দনিক দিকসমূহের বিকাশ সাধন।
   খ. গণতান্ত্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিস্ফুটন।
   গ. অজানা পরিস্থিতি মোকাবেলা ও উদ্ভাবনের জন্য আত্মবিশ্বাস জাগতকরণ
   ঘ. প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

ঙ. কঠোর পরিশ্রম এবং শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ সাধন।

চ. ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতির প্রতি নিবেদিতকরণ।

ছ. দেশের অখন্ডতা, সম্মান ও অগ্রগতির স্বার্থ উর্দ্ধে তুলে ধরার জন্য নিবেদিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার উন্নয়ন।

৫) বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের তত্ত্ব, তথ্য ও জ্ঞানের বিকাশ সাধন এবং ভাষা যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জনের পাশাপাশি খেলাধুলা এবং আমোদ প্রমোদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি।

৬) দেশের অগ্রগতির ধারা ও কর্মক্ষেত্রের সুযোগের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা প্রদান।

৭) শিক্ষার বিস্তার এবং মানোন্নয়ন যাতে ধর্ম, বর্ণ, মতাদর্শ, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে নারী পুরুষ প্রত্যেকেই নিজকে সর্বোচ্চ বিকাশের সুযোগ পায়।

৮) সহনশীলতা ও অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা দেয়া।

৯) শিক্ষার সাথে সমাজের যোগসূত্র স্থাপন।

জাপানের জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ হতে যে সংবিধান কার্যকর করা হয়, তাতে জনগণের শিক্ষার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয় ঃ All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability, as provided by law. The people shall be obligatged to have all boys and girls under their protection receive general education as provided for by law. Such compulsory education shall be free."

সংবিধানের এসব বাণীকে প্রতিফলিত করে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে "শিক্ষার মৌলিক আইন"-এ শিক্ষার লক্ষ্য ও নীতিমালা আরও বিশদভাবে উল্লেখ করে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, একটি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত সমাজ গঠনের জন্য জনগণকে আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

১৯৮৯ খৃস্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একবিংশ শতকে জাপানি সমাজের কাংখিত পরিবর্তন, জীবনযাত্রা ও মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি পরিবর্তন করে। জাপানের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. শিশুর বিকাশের স্তর ও প্রতিটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা পূর্বক শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে দৃঢ় ও সমৃদ্ধ করে তোলা।

খ. দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় ও মৌল অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান ও দক্ষতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষা কার্যক্রমকে এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তায় পূর্ণাঙ্গ বিকাশে শিক্ষার সব স্তরে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়ের ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্যতা অক্ষুণ্ন থাকে।

গ. পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল ও স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ।

ঘ. জাপানের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা এবং অন্যান্য দেশের কৃষ্টি, ঐতিহ্য অবগত হয়ে বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে জাপানের ছেলেমেয়েরা যেন জীবনযাপনের উপযোগী গুণের বিকাশ ঘটাতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

মানব সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মূল উপাদান। জাতিকে আজ স্ব-নির্ভর করে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাকে এ চাহিদার পরিপূরক করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আজ সমগ্র জাতির সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। দুর্জয় সাহস আর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা বড় প্রয়োজন কারণ মানব সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ নিহিত আছে উপযুক্ত শিক্ষায়।

মূল্যায়নঃ

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৭-এ উল্লেখিত বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

২. বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে ভারত ও জাপানের শিক্ষার লক্ষ্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

দেশাত্ববোধ সৃষ্টি, সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ, বিজ্ঞানমনস্ক করা, শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করা, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ সৃষ্টি, বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন, নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশসাধন, নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়া, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর, পরিবেশ সচেতন করা।

পর্ব-খ ও গ, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন

ইউনিট-৫ **অধিবেশন-২**

অন্তর্নিহিত দার্শনিক চিন্তার প্রভাব

ভূমিকা

যে কোন দেশের শিক্ষার লক্ষ্য নানা দার্শনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। সে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে দার্শনিক মতবাদগুলো শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য এককভাবে কোন দার্শনিক মতবাদ প্রভাব না ফেলে ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ, বাস্তববাদ এবং জড়বাদ প্রভৃতি একাধিক মতবাদ সে দেশের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে প্রভাব ফেলে থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে ঐ সকল দার্শনিক মতবাদের প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত দার্শনিক চিন্তার প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে অন্ড়র্নিহিত দার্শনিক চিন্তার প্রভাব

বাংলাদেশে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণে ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ এবং বাস্তববাদ এই ৪টি মতবাদের সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে। ভাববাদীদের মতে, ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস এবং আত্মোপলব্ধি শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। সুনাগরিকত্ব, মানবতা এবং নৈতিকতা ইত্যাদি ভাববাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। জড়বাদীদের মত হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে যুক্তিনির্ভর এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন। প্রকৃতিবাদীদের মতে প্রকৃতিই শিক্ষার নিয়ন্ত্রক এবং প্রয়োগবাদীদের মতে জীবনের জন্য শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার আসুন আমরা বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ থেকে (পূর্ববর্তী অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে) ৪টি লক্ষ্য বেছে নিই, যে ৪টি লক্ষ্য ভাববাদ, জড়বাদ, প্রকৃতিবাদ এবং প্রয়োগবাদ দ্বারা প্রভাবিত। সেগুলো নিম্নের ছকে লিখি।

দার্শনিক মতবাদ	বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য
ভাববাদ দ্বারা প্রভাবিত	
জড়বাদ দ্বারা প্রভাবিত	
প্রকৃতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত	
প্রয়োগবাদ দ্বারা প্রভাবিত	

পর্ব-খঃ শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ, বাস্তববাদ ও জড়বাদ প্রভাব বিস্তার করে।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, মূল শিখনীয় বিষয়-এ উল্লিখিত 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ' শীর্ষক অংশটি মনোযোগ সহকারে পূরণ করুন এবং প্রত্যেকটি মতবাদের দুটি করে বৈশিষ্ট্য নিম্নের ছকে লিখুন।

দার্শনিক মতবাদ	বৈশিষ্ট্য
ভাববাদ	১. ২.
প্রকৃতিবাদ	১. ২.
প্রয়োগবাদ	১. ২.
বাস্তববাদ	১. ২.
জড়বাদ	১. ২.

ইউনিট-৫ অধিবেশন-২

মূল শিখনীয় বিষয়

অন্তর্নিহিত দার্শনিক চিন্তার প্রভাব

ক) শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত দার্শনিক চিন্তার প্রভাব

শিক্ষা জাতীর ভবিষ্যৎ উন্নতির চাবিকাঠি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষা সঞ্চিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং কৃষ্টিগত অধিকারের নবলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত করে স্বস্ব জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তর করে দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথকে সুগম করে। সাধারণভাবে শিক্ষার উপরিউক্ত ভূমিকা সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হলেও বাংলাদেশের জন্য এ বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। একটি দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হবে তা নানা দার্শনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। দার্শনিকগণ তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মতবাদ ব্যক্ত করে থাকেন। দার্শনিক মতবাদগুলি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যবহৃত হয় সে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে এককভাবে কোন দার্শনিক মতবাদ প্রভাব না ফেলে একাধিক মতবাদ কোন দেশের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে প্রভাব ফেলে থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে দর্শনের প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আঠার শতকে রুশো বলেছেন "সকল কৃত্রিমতা বিসর্জন দিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী শিশুর শক্তি-সামর্থ্যের সর্বাঙ্গীন স্বাভাবিক বিকাশ হবে শিক্ষার লক্ষ্য"। পরবর্তীকালে রুশোর শিষ্য পেষ্টালৎসি (Pestalozzi) চাইলেন শিক্ষাকে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে। জার্মান দার্শনিক হার্বার্ট (Herbart) নৈতিক চরিত্র জীবনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। দার্শনিক ফ্রোয়েবল (Fraebol) শিশুর শক্তির সম্ভাবনার ক্রম উন্মেষকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে অভিহিত করেন। শিক্ষার চারটি লক্ষ্যঃ ১. পূর্ণ গুণী মানুষ গড়া, ২. বিভিন্ন অর্থকরী বিষয়ে দক্ষতা প্রদান, ৩. বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগ প্রদান, এবং ৪. শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তন, অগ্রগতি ও রূপান্ড়রের হাতিয়ার। শিক্ষার্থীর শিক্ষা হবে তার শক্তি, সামর্থ্য, রুচি গ্রহণক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে তাকে আদর্শ সামাজিকে পরিণত করা। আদর্শ সামাজিক

বলতে বোঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তির জীবন শুধু তার নিজের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

প্রাচীনকালে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির প্রকৃতি ও স্বভাব অনুযায়ী তার অভ্যন্ড়রীণ সম্ভাবনাকে বিকশিত করা। মধ্যযুগে শিক্ষার আদর্শ হলো ধর্মানুশাসন। মানুষ জীবনে সামাজিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক- সব দিকই কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় শিক্ষার লক্ষ্য হবে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উন্মোচন, ব্যক্তির সকল শুভ সম্ভাবনার স্ফুরণ, ব্যক্তির সংগে সমাজের যোগ, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ, শিক্ষিত অশিক্ষিতের বৈষম্য বিমোচন, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমন্বয়, জ্ঞান বোধ, কল্পনা ও সৌন্দর্য চেতনার উৎকর্ষ ও বিকাশ কল্পে জ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা জীবনের সম্পূর্ণতা ও সমৃদ্ধি অর্জন, সৃজনশীলতার সাহায্যে মনুষ্যত্বের পরিচর্যা এবং প্রসার।

বাংলাদেশের শিক্ষার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রিয় মূলনীতিগুলোর প্রতিফলন রয়েছে। কারণ রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মধ্যেই জনগনের আশা-আকাঙ্খা যুগের চাহিদা ও জাতির জীবন ব্যবস্থা বিবৃত থাকে। সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো হচ্ছে-

* সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস
* জাতীয়তাবোধ
* গণতন্ত্র এবং
* অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে সমাজতন্ত্র

ধর্মীয় শিক্ষাদর্শন দেশ ও কালভেদে শিক্ষার গতিপ্রকৃতি নিরূপণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে এসেছে। ধর্ম বিশ্বাস মানবজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করেছে। শিক্ষা এই উত্তরাধিকারেরই একটি অন্যতম দিক। তাছাড়া ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে উল্লিখিত শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে :

* স্বদেশ প্রেম ও সুনাগরিকত্ব
* মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্ব
* নৈতিক মূল্যবোধ
* সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়াররূপে শিক্ষা

* প্রয়োগমূখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূল শিক্ষা

* নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুনাবলী, সৃজনশীলতা ও গবেষণা।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে দার্শনিক মতবাদের প্রভাব

মতবাদগুলোর মধ্যে ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ ও বাস্তববাদ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে। ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস (Self-Development) ও আত্মোপলব্ধি (Self-Realisation) উন্মেষ ঘটানোই ভাববাদীদের মতামত। তাছাড়া ভাববাদীদের তত্ত্ব থেকেই শিক্ষার উন্মেষের তত্ত্বটির সৃষ্টি হয়েছে। শিশুর মধ্যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ণ সম্ভাবনাগুলি নিহিত থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পূর্ণতার পথে একমাত্র শিক্ষাই নিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সুনাগরিকত্ব, মানবতা, বিশ্ব নাগরিকত্ব এবং নৈতিকতা ভাববাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত।

জড়বাদের মতানুসারে শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরানো কল্পনা ভিত্তিক পদ্ধতি পরিহার করে আধুনিক যুক্তিনির্ভর পদ্ধতিসহ বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন।

শিশুকে প্রকৃতির কাছে ছেড়ে দাও। শিশু প্রকৃতি থেকে শিখবে। প্রকৃতিবাদের মতানুসারে স্বাভাবিক পন্থায় শিশুর অন্তরবাসী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ সাধন হয়। কেবল স্বাধীনতাই নয় শিশুর উপর কোনরূপ কৃত্রিম শৃঙ্খলাও আরোপ করা চলবে না।

সর্বজনীন চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সত্য বলে কোন সত্য নেই। কাজের প্রকৃত সম্পাদন এবং সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে তার সত্যতে পৌছাতে হবে। সামাজিক রূপান্তর, প্রয়োগমূখী, অর্থনৈতিক অনুকূল শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য হাতে কলমে কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।আগ্রহ হল শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশ প্রচেষ্টারই বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া শিক্ষার পরিবেশ হবে গণতন্ত্রমূখী। শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান ও মননশীল চিন্তনের সাহায্যে প্রতিটি ভাব ও ধারণা পরীক্ষা করে সেটি গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে।

বিশ্বনাগরিকত্ব বা আন্তর্জাতিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়। নেতৃত্ব, সংগঠনের

গুনাবলী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে লুকায়িত সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার লক্ষ্যে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির আয়োজন করা হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য জাতীয় আদর্শ সামাজিক চাহিদা থেকে উৎসারিত। শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যের নিরিখেই যাচাই বাছাই করা হয় এবং ঐ সব গুণাবলি অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। আমাদের শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করা। একজন আদর্শ নাগরিক জ্ঞান, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়ে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলোর মত বাংলাদেশকেও একটি সমৃদ্ধ, উন্নত এবং সুখী দেশ হিসাবে গড়ে তুলবে।

খ) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ

ভাববাদ

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এই মতবাদের প্রণেতা। এর অনুসারীরা হলেন- কেন্ট, পেস্তালৎসী, ফ্লোয়েবেল, রাস্ক এবং আরও অনেকে। ভাববাদীদের মতে, শিক্ষা সুপ্ত সম্ভাবনা পরিবর্তন বা বর্ধন করতে পারে না, কেবল মাত্র পূর্ণতা লাভে সহায়তা করতে পারে। তাঁরা আরও বলেন- জীব আত্মার মধ্যে যখন পরম আত্মার বিকাশ ঘটবে তখনই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। প্লেটোর শিক্ষা দর্শনের মূল কথা হল ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে নৈতিক উৎকর্ষ ও সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা। আসলে ব্যক্তি সত্ত্বার সঙ্গে সমাজের স্থিতিস্থাপকতা ও ঐক্য সাধন করাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। তিনি শিক্ষাকে আত্মার পূর্ণ বিকাশের প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শিক্ষা হল এক ধরনের সমান্তরের প্রক্রিয়া। ব্যক্তির অন্ড়রাত্মাকে প্রকৃত দর্শনের দিকে পরিচালিত করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

প্রকৃতিবাদ (Naturalism)

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদ এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রকৃতিবাদীদের মতে- প্রকৃতিই শিক্ষার নিয়ন্ত্রক, মানুষ নয়। তাঁরা মনে করেন, শিশু শিক্ষা পরিচালিত হবে প্রকৃতির কোলে, শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী। তাঁরা প্রাকৃতিক বিষয় ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা হিসাবে অভিহিত করেছেন। শিশুরা তিন রকম শিক্ষকদের কাছ থেকে পাঠ শেখে। যথা- প্রকৃতি, মানুষ ও বস্তুসামগ্রী। জ্য জ্যাক রুশো এই মতবাদের জনক। তিনি তার এমিল

(Emile) গ্রন্থে প্রকৃতিজাত শিক্ষার বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এই মতবাদ অনুসারে মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। যাবতীয় ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে এবং বস্তুর রূপান্ড়র প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক শৃঙ্খলামুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীর সহজাত শক্তি, সম্ভাবনা, রুচি, ইচ্ছা, আগ্রহ ইত্যাদির বিকাশ লাভই প্রকৃতিবাদের মূল কথা। তাছাড়া তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও প্রত্যক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপের কথাও বলেছেন।

প্রয়োগবাদ (Pragmatism)

প্রয়োগবাদীদের মতে- Education is the acquisition of the art of utilization of knowledge. যে শিক্ষা জীবনের প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগে না তাকে প্রয়োগবাদীরা শিক্ষাই বলে না। বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য বা নিদিষ্ট সত্য বলে কিছু নেই। বর্তমানে যা সত্য, অন্য যুগে তা সত্য নাও হতে পারে। পরিবর্তনশীল ও ফলাফলের ওপর সত্য নির্ভরশীল। জন ডিউই সর্বপ্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয় করে সমাজ জীবনের সক্রিয়তাকে গুরুত্ব দেন। তাছাড়া গঠনমূলক সৃজনধর্মী কাজে সহযোগিতামূলক মনোভাব ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করেন। এ মতবাদের সমর্থক হচ্ছেন জন ডিউই, উইলিয়াম জেমস, শিলার এবং জনক হলেন বিশিষ্ট দার্শনিক হিরাক্লিটাস ।

বাস্ড়বাদ (Realism)

বস্তু এবং বস্তুর উর্দ্ধে যে সব বিষয়ের অস্তিত্ব আছে সে সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাই হল শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার দার্শনিক তত্ত্বগুলোর মূল কথাই হল শিশুকে জীবন ও কর্মমূখী করে তৈরী করা। বাস্তবতা বিবর্জিত শিক্ষা কোন শিক্ষা নয়। প্রকৃত শিক্ষা কার্য সম্পাদন ছাড়া আসে না। জন ডিউইর এ নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা পৃথিবীর সর্বত্রই গৃহীত হয়েছে এবং প্রচলিত লিখন পঠন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। হাবার্ট স্পেন্সার এই মতবাদের প্রণেতা। অনেকে দার্শনিক এ্যারিস্টটলকেও এই মতবাদের প্রণেতা বলে মনে করেন।

জড়বাদ (Materialism)

জড়বাদীদের মতে ভাব কোন পরম সত্তা নয়, দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুনিষ্ঠ বিশ্বাসকে তারা একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেন। জন ডিউইকে আধুনিক জড়বাদের জনক বলা হয়।

শিক্ষা মানুষের মানসিক শক্তি বাড়াতে পারে, আর সামাজিক ও নৈতিক শক্তি জাগ্রত করতে পারে। তাই জড়বাদীদের নিকট শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের আধুনিক প্রগতিশীল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা জড়বাদের সমগোত্রীয়ই বলা হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে জড়বাদীদের মিশন হল -(১) শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে পরিচিত করা, (২) বস্তুমূখী দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি, (৩) বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন। জড়বাদ কল্পনাভিত্তিক পদ্ধতি পরিহার করে শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক যুক্তি নির্ভর পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে।

সময়ের সাথে কালের বিবর্তনে মনীষীদের চিন্তায় ও গবেষণায় শিক্ষা এক পরিশীলিত রূপ লাভ করেছে। শিক্ষার দার্শনিক তত্ত্বগুলোর মূল কথাই হল আগামী প্রজন্ম ভবিষ্যৎ কর্ণধার শিশুকে জীবন ও কর্মমূখী করে তৈরি করা। তাছাড়া জীবনে সততা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে ব্যক্তির জীবন মহিমান্বিত করা।

মূল্যায়নঃ

১. শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।

২. বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে অন্তর্নিহিত দার্শনিক চিন্তার প্রভাব পর্যালোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

দার্শনিক মতবাদ	বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য
ভাববাদ দ্বারা প্রভাবিত	সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ সাধন করা।
জড়বাদ দ্বারা প্রভাবিত	শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করা।
প্রকৃতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত	পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করা।
প্রয়োগবাদ দ্বারা প্রভাবিত	বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করা।

পর্ব-খ, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৫ **অধিবেশন-৩**

লক্ষ্য অর্জনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষকগণের বাঁধা/ প্রতিবন্ধকতাসমূহ

ভূমিকা

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু লক্ষ্য অর্জনে যেসব সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন সেসব সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে বিদ্যালয় প্রশাসন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেক বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। তথাপি সকল বাধা-বিপত্তি দূরীভূত করে জাতীয় উন্নয়নে বিদ্যালয় রূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে যেতে হয়। কারণ বিদ্যালয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষকগণের বাধা/ প্রতিবন্ধকতা সমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কীভাবে বাধা/ প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষকগণের বাধা/ প্রতিবন্ধকতাসমূহ শনাক্তকরণ

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষকদের শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাব, পেশার প্রতি পুরোপুরি অনুগত না হওয়া, শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, লাইব্রেরীতে বইয়ের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব, শ্রেণীকক্ষের অপর্যাপ্ততা, নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন না হওয়া, শিক্ষকদের প্রয়োজনমত বেতনভাতাদি ও স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয় পরিবেশের অভাব প্রভৃতি উলে- খযোগ্য।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আর যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন সেগুলো নিম্নের ‘মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা’ এবং ‘বিদ্যালয় শিক্ষক

সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা' শীর্ষক দুটি মাইন্ড ম্যাপিং -এ 'কী (key)' পয়েন্ট-এর মাধ্যমে লিখুন এবং মূল শিখনীয় বিষয়ে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতার সাথে মিলিয়ে দেখুন।

মাইন্ড ম্যাপিং-১

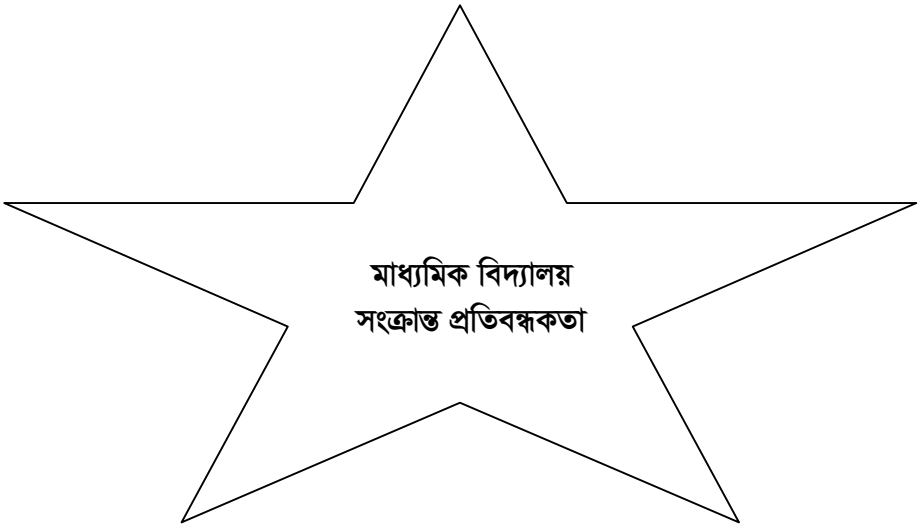

মাইন্ড ম্যাপিং-২

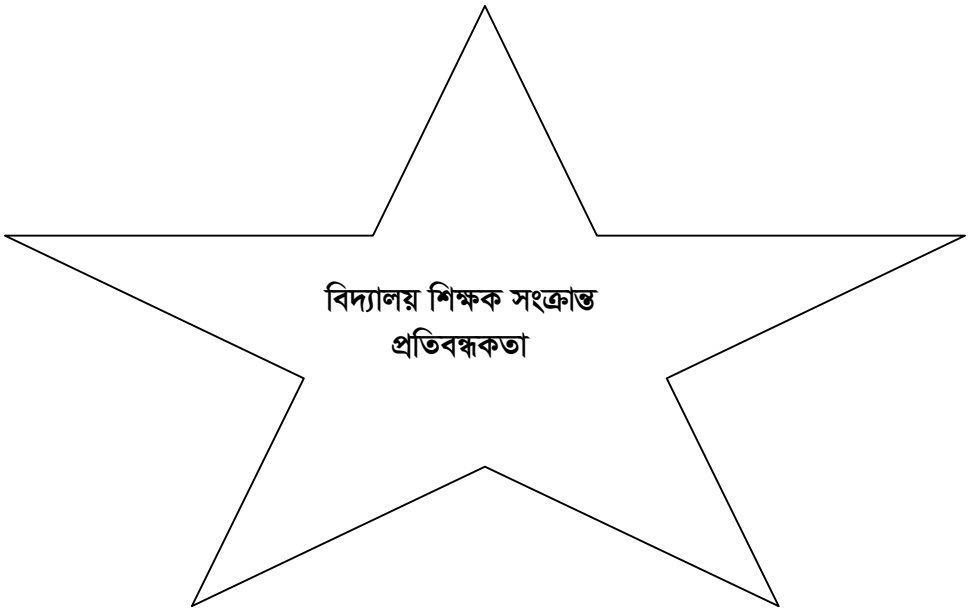

পর্ব-খঃ শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন বাঁধা/ প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের ব্যবস্থা

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষকদের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে, নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের মান উন্নত করে, প্রয়োজনীয় বই দিয়ে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করে, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য স্কুলে খেলার মাঠ ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করে, শিক্ষকদের বেতনভাতাদি বৃদ্ধি করে প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণসহ আর কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা নিম্নের ছকে 'কী (key)' পয়েন্ট-এর মাধ্যমে লিখুন।

ক্রমিক নং	ব্যবস্থার ধরন	প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ
১	বিদ্যালয় প্রশাসন সম্পর্কিত ব্যবস্থা	
২	শিক্ষক সম্পর্কিত ব্যবস্থা	
৩	শিক্ষার্থী সম্পর্কিত ব্যবস্থা	
৪	বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত ব্যবস্থা	
৫	শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা	

ইউনিট-৫ অধিবেশন-৩

মূল শিখনীয় বিষয়

লক্ষ্য অর্জনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষকগণের বাধা/ প্রতিবন্ধকতা সমূহ

মানব সমাজের অগ্রযাত্রায় যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিদ্যালয় তাদের মধ্যে অনন্য একটি প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া বিদ্যালয় একটি সুপ্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়াসে সমাজের বর্তমান জনগোষ্ঠী তাদের প্রচলিত শিক্ষাধারা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়। যুগ যুগ ধরে সমাজের সঞ্চিত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, প্রচলিত রীতি-নীতি এবং ধ্যান-ধারণা সংরক্ষণ ও এর সংগে শিশুর পরিচয় ঘটানোর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অসীম। সমাজ ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের একটি কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে বিদ্যালয়। বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজের একটি অঙ্গ। বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। বিদ্যালয় হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক রীতি-নীতি মূল্যায়নের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

ক) লক্ষ্য অর্জনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষকগণের বাধা/ প্রতিবন্ধকতাসমূহ

মানব সমাজের ক্রমাগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে মানুষের মাধ্যমেই। সমাজের অন্যান্য সদস্যদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে আনার ক্ষেত্রে, সু-নাগরিক তৈরি ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার ক্ষেত্রে, সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে, শিক্ষকবৃন্দ মহান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মানুষের বহুমুখী গুণ ও প্রতিভার বিকাশ সাধনের দ্বারা মানুষকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য সৃষ্টি হয়েছে বিদ্যালয়ের। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে কতর্ব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশল দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ করা। বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন উভয়ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা বিরাজ করছে যা কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। জাতীয় উন্নয়নে উপযুক্ত ভুমিকা পালনে সক্ষম দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকগণের বাধা/ প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

এই বাধা/ প্রতিবন্ধকতাকে দুটো ভাগেভাগ করা যায়। যথা:

* মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত বাঁধা।

* মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংক্রান্ত বাঁধা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত সবাঁধা

সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে এবং গতিশীল করে মানুষ। মানুষকে সমাজের উপযোগী করে বিদ্যালয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ সমাজের ভবিষৎ প্রজন্মকে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অধিকারী করে গড়ে তোলে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় আদর্শ এবং পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মত আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার জন্য সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির পথ সুগম করে দেয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার কারণে তা সহজভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে ওঠে না। নিম্নে বিভিন্ন বাধা/ সমস্যাগুলি উল্লেখ করা হলঃ

মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত বাঁধা

১। স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর বিদ্যালয়ের পরিবেশের অভাব।
২। শ্রেণী কক্ষে আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা ।
৩। ব্লাক বোর্ড/ চক বোর্ডের অনুপযুক্ততা।
৪। বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষণাগারের অপ্রতুলতা।
৫। বিজ্ঞান পরীক্ষণাগারে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব।
৬। উপযুক্ত সংখ্যক শ্রেণী কক্ষের অভাব।
৭। লাইব্রেরীতে মানসম্মত ও বিষয় ভিত্তিক বইয়ের অভাব।
৮। পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারীর অভাব।
৯। শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বৈষম্য।
১০। নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন না হওয়া।
১১। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির তদারকীর অভাব।
১২। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলাদা শৌচাগারের অভাব।
১৩। ছাত্র/ছাত্রীদের খেলার জন্য মাঠের অভাব।
১৪। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনায় আর্থিক ও বস্তুগত সুযোগ সুবিধার অভাব।
১৫।ফ্যাসিলিটিস বিভাগের সাথে স্কুলগুলোর সমন্বয়ের অভাব ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা।
১৬। খেলাধুলার সরঞ্জামের অপর্যাপ্ততা।
১৭। স্বাস্থ্যসম্মত পানযোগ্য পানির অভাব।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংশিষ্ট বাঁধা

শিক্ষকগণ মানুষ গড়ার কারিগর তাদের হাতেই গড়ে উঠবে আগামী দিনের সুনাগরিক। কিন্তু অনেক শিক্ষক শিক্ষকতা পেশার মাধ্যমে জীবনযাপন করলেও পেশাটির প্রতি তাদের মমত্ববোধ ও যোগ্যতার অভাব দেখা যায়। ফলে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জন। নিম্নে শিক্ষকদের বাধা সংক্রান্ত অসুবিধাসমূহ তুলে ধরা হলো:

বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বাঁধা

১। বিষয়ভিত্তিক দক্ষ ও কর্মঠ শিক্ষকের অভাব।

২। দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব ।

৩। শিক্ষকদের কমিটমেন্টের অভাব ।

৪। শিক্ষার্থীদের ভিতর কৌতুহল, অনুসন্ধিৎসা, যৌগিক চিন্তা ও মৌলিক ধারণা তৈরী করতে না পারা।

৫। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের অনিশ্চয়তা।

৬। শিক্ষকদের শ্রেণী পাঠদানে প্রস্তুতির অভাব।

৭। শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পৌণঃ পৌণিক প্রশিক্ষণের অভাব ।

৮। শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক লক্ষ্য সম্পর্কিত অজ্ঞতা।

৯। টিউশনিতে অধিক মনোযোগ প্রদান।

১০। শিক্ষকদের সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতা ও অনিশ্চয়তা।

১১। পেশার প্রতি পুরোপুরি অনুগত না হওয়া।

১২। পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিগত ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ-খাওয়াতে না পারা।

১৩। শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চিন্তা, অভ্যন্তরীণ চিন্তা ও গুণাবলি বিকাশে ব্যর্থ হওয়া।

১৪। মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক তৈরি করতে ব্যর্থ হওয়া।

১৫। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাভাবিক অনুপাত।

১৬। শিক্ষক-অভিভাবকদের নিয়মিত মিটিং না হওয়া।

১৭। বহুসংখ্যক শিক্ষকদের পদ ব্যাপক সময় ধরে শূন্য পড়ে থাকা।

১৮। সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বেতন ও ব্যবস্থাগত বৈষম্য।

১৯। শিক্ষকদের নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি ও কলাকৌশলের জ্ঞানের অভাব।

২০। শ্রেণী পাঠদানে অবহেলা।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলো যথাযথভাবে দুর করা হলে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। তবে লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষকদের সদিচ্ছা এবং লক্ষ্য অর্জনের উপায়

সম্পর্কিত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা পরিষদের আন্তরিকতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আর্থিক সহায়তা লক্ষ্য অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষকগণের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়

প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়

১। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য খেলার মাঠ, শৌচাগার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।
২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩। শিক্ষকদের সকল শূন্য পদে প্রশিক্ষক প্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে হবে।
৪। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয় ভিত্তিক, স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন, দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৫। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের উন্নয়ন সাধন করা।
৬। শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনভাতা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণ বহন করা।
৭। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ফলো-আপ করা।
৮। প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বই পুস্তক দিয়ে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধকরা।
৯। শিক্ষকদের আর্থিক সংকট নিরশনের জন্য সহজ সত্ত্বে ঋণ প্রদানের জন্য সরকারকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে শামসুল হক শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্টে উল্লেখিত অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।
১০। উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকদের যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
১১। সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজের ও গুরুত্ব দেওয়া দরকার।
১২। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটিকে সক্রিয় হতে হবে।
১৩। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাসহ যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করতে হবে।
১৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার।
১৫। শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ও ব্লাক বোর্ড / হোয়াইট বোর্ডের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
১৬। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হতে হবে ১:৪০।
১৭। শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বৈষম্য দূর করা দরকার।
১৮। ফ্যাসিলিটিস বিভাগের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণী কক্ষের ব্যবস্থা করা।
১৯। পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা দরকার।
২০। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে শিক্ষক অভিভাবক মিটিং করা প্রয়োজন।
২১। শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আরামদায়ক শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।
২২। শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দায়িত্ব বিবেচনায় রেখে যথাযথ নৈতিক সমর্থন ও বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা দরকার।
২৩। শিক্ষকদের অনুকূল কর্মপরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২৪। শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের বেতন বৃদ্ধির সুযোগ থাকলে এটি শিক্ষকদের জন্য প্রেরণার কাজ করত।

২৫। শিক্ষকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্মান প্রদর্শন, খেতাব প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষকতা পেশার আকর্ষণ ও মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আচার-আচরণ, বেশভূষা ও খাদ্যাভাসের পরিবর্তন আসছে। তাই এই পরিবর্তনশীল সমাজে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে খাপ-খাওয়ানো, দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে যোগ্যতার সাথে অংশগ্রহণের জন্য তৈরির লক্ষ্যে উপরোক্ত সমস্যা/ বাঁধা জরুরিভিত্তিতে সমাধান করা এবং সফল ও সুন্দরভাবে লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগমের জন্য নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মূল্যায়নঃ

১. শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করুন। এই প্রতিবন্ধকতা কীভাবে দূর করা যায় ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

মাইন্ড মাপিং-১

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের অভাব, শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা, প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব, বিজ্ঞানাগার ও বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতির অভাব, লাইব্রেরীতে পুস্তকের অভাব, কর্মচারীর স্বল্পতা, উপর্যুক্ত খেলার মাঠের অভাব, খেলাধুলার সরঞ্জামের অভাব।

মাইন্ড মাপিং-২

দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের অনিশ্চয়তা, শিক্ষকদের কমিটমেন্টের অভাব, শিক্ষকদের জন্য অপ্রতুল বেতনভাতা বরাদ্দ, শিক্ষকদের শ্রেণী পাঠদানের প্রস্তুতির অভাব, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অস্বাভাবিক অনুপাত, শিক্ষক পদ শুন্য থাকা, শিক্ষক-অভিভাবকদের নিয়মিত সভা না হওয়া।

পর্ব-খ, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৫ অধিবেশন-৪

পরিবর্তনশীল সমাজে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা

ভূমিকা

যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন সমাজ গঠিত হচ্ছে। আবার এ গঠন কখনো স্থায়ী হয় না। প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। যার মূলে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির ক্রমউন্নয়ন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন, সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের ধারণা। উল্লিখিত প্রত্যয়সমূহের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ছে এবং সুচিত হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। বিদ্যালয় যেহেতু একটি শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠান সেহেতু এই সামাজিক পরিবর্তনে বিদ্যালয়ের বলিষ্ঠ ভূমিকা বিদ্যমান।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- সমাজ ও সমাজের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সমাজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।
- শিক্ষার প্রভাবে সমাজের কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছে তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রভাব সমাজে কীরূপে এবং কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা যাচাই করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক ঃ সমাজের বৈশিষ্ট্য

অনেকগুলো মানুষ যখন এক স্থানে একত্রিত হয়ে বসবাস করে তখন গঠিত হয় একটি সমাজ। অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ ও শৃংখলাবদ্ধ জনগোষ্ঠিকে সমাজ বলে। একটি সমাজের বৈশিষ্ট্য অনেক। সমাজ তখনই হবে যখন সঙ্ঘবদ্ধ ও শৃংখলাবদ্ধ জনগোষ্ঠি কতকগুলো নিয়ম-নীতি ও আচার অনুষ্ঠান মেনে চলবে, পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে অভিন্ন সংস্কৃতিভুক্ত হবে, জীবন যাপনে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে, প্রয়োজনে একে অপরের কাজে আসবে, সমাজের জনগোষ্ঠির চাহিদা মেটাবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করবে ও দক্ষ কর্মী ও জনবল গড়ে তুলবে।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, বাংলাদেশে চাকমা উপজাতির সামাজিক বৈশিষ্ট্যের তিনটি উদাহরণ নিম্নের ছকে লিখুন।

ক্রমিক নং	**চাকমা উপজাতির সামাজিক বৈশিষ্ট্য**
১.	
২.	
৩.	

পর্ব-খঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমাজের প্রতিচ্ছবি

শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী ভবিষ্যত জীবনে সমাজের সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের অভিজ্ঞতা বিদ্যালয় থেকে পায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী সমন্বয়ে সম্পাদিত সকল কর্মকান্ডে সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। এ কারণে বিদ্যালয়কে বৃহত্তম সমাজের প্রতিচ্ছবি বলা হয়ে থাকে।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, সমাজে বিদ্যমান এরূপ তিনটি বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্ত ছকে উদাহরণের মাধ্যমে উল্লেখ করুন যেগুলো বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র পরিসরে লক্ষ্য করা যায়।

১.
২.
৩.

পর্ব-গ : সামাজিক পরিবর্তন ও প্রগতিশীলতা এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টতা

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারণে সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মান, রূপ ও জীবন ধারার পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘটে চলে সামাজিক পরিবর্তন। আর এ সামাজিক

পরিবর্তনে যেসকল প্রত্যয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে তা হলো সংস্কৃতির পরিবর্তন, জীবন যাত্রার পরিবর্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরনের পরিবর্তন, বিশ্বায়ন চিন্তার সৃষ্টি, পরিবেশের পরিবর্তন এবং শ্রমিক শক্তির পরিবর্তন। যেহেতু বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি সেহেতু সামাজিক পরিবর্তনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ব্যাপক। কাজেই বিদ্যমান রয়েছে বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নির্ভরশীলতা।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, সামাজিক পরিবর্তনে বিদ্যালয় কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে 'কী (key)' পয়েন্ট-এর মাধ্যমে নিম্নের ছকে উল্লেখ করুন।

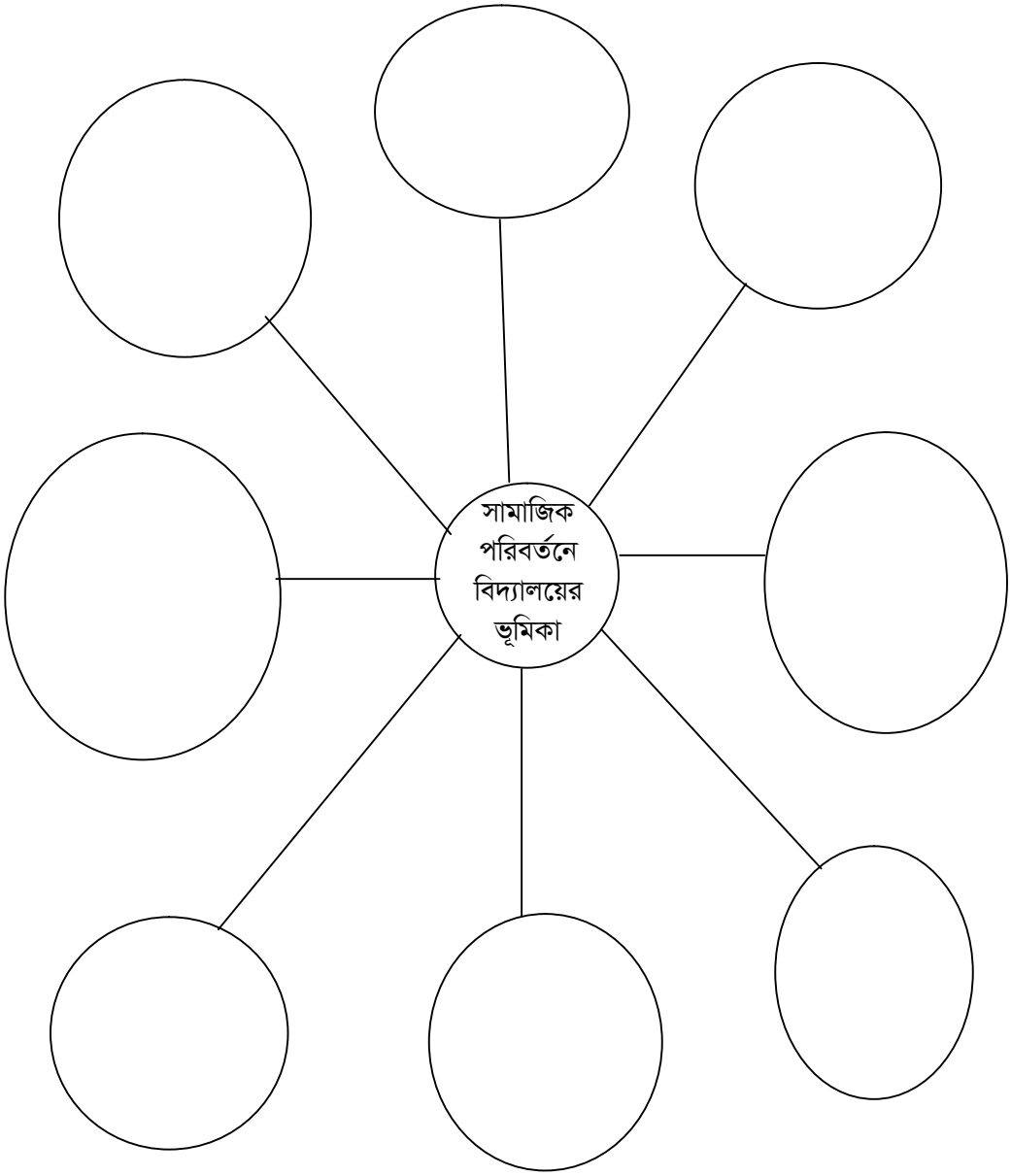

ইউনিট-৫ অধিবেশন-৪

মূল শিখনীয় বিষয়

পরিবর্তনশীল সমাজে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা

শিক্ষা কাঠামোতে মাধ্যমিক স্তরটি সামগ্রিক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিরূপণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (১৯৭৪) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ''শিক্ষা ব্যবস্থা কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ও উচ্চ শিক্ষার পূর্ববর্তী শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা নামে পরিচিত।'' অতএব যাদের জন্য এটা প্রান্তিক শিক্ষা তাদের জন্য এ স্তরের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রভাব সমাজে প্রতিফলিত হয়। তেমনি যারা উচ্চ শিক্ষা লাভে অগ্রসর হয় তাদের মধ্যেও এর প্রভাব নিবদ্ধ থাকে। এজন্য সমাজ ও মাধ্যমিক শিক্ষার সম্বন্ধ অতি নিবিড়।

সমাজ কি?

কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী একদল লোক যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে অভিন্ন জীবন প্রণালী এবং সর্বজন গৃহীত কতকগুলো সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বন্ধনে ও কতকগুলো নিয়ম-নীতিতে আবদ্ধ হয় তখনই সমাজ গঠিত হয়। শিক্ষা ও সমাজ পরস্পর নির্ভরশীল। বস্তুত সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষা এবং শিক্ষার জন্য সমাজ, আর সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করে। শিক্ষার কাজ সমাজ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করে সমাজের কল্যাণ সাধন করা।

বাংলাদেশের সমাজের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম একটি দেশ। সহস্রাব্দের ঊষালগ্নে সারা বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। সে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের ধারণা। এ সবের প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশেও, ফলে সূচিত হচ্ছে পরিবর্তন। বাংলাদেশের সমাজের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা সম্বন্ধে নিম্নে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হল :

১. **সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ ঃ** প্রতিটি সমাজের নিজস্ব কতকগুলো সংস্কৃতি আছে। এই সংস্কৃতির মাধ্যমেই সমাজের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। এক সংস্কৃতির প্রভাবে অন্য সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়। আর এটাই সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য। যেমন পহেলা জানুয়ারি ও ভ্যালেনটাইন ডে পালন করা। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে আমাদের দেশে প্রবর্তিত হয়েছে।

২. **সহযোগিতা ও সহমর্মিতাঃ** সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা থাকা সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজে বিভিন্ন পেশা, ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির লোক বসবাস করে। সকলে সহাবস্থানে পরস্পরের প্রতি সহনশীল আন্ড়রিকতার সহিত বসবাস করতে হয় সমাজে। সুখে দু:খে একে অপরের অংশীদার হয়ে থাকে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য UNESCO তে যে চারটি বিষয় এর কথা উলে-খ করা হয়েছে তার চতুর্থটি হচ্ছে Learning to live together অর্থাৎ 'একত্রে বসবাস করতে শেখা।' ছোট বড় সমাজ ও সমগ্র বিশ্বে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সহনশীল, সহমর্মিতা ও সহযোগতিার সাথে বসবাস করতে শেখা।

বাংলাদেশের সমাজের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা

৩. **শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানঃ** মাধ্যমিক শিক্ষা অনেকের জন্য প্রান্তিক শিক্ষা তাই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক তুল্য মানে উন্নীতকরণের সঙ্গে স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সমাজের তরুণদের জীবন যাত্রার মান উন্নীত করার প্রয়াস মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে চলছে। সমাজ ব্যবস্থায় আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি সমাজের একটি বৈশিষ্ট্যও বটে এবং সমাজের জনগোষ্ঠীর চাহিদাও এটা।

৪. **দক্ষ জনশক্তিঃ** যেখানে একটি সমাজ সেখানেই বিভিন্ন পেশা ও কর্মের জনশক্তি সমাজের প্রয়োজনেই অবস্থান করে। বিভিন্ন পেশাজীবীর অবস্থান সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন প্রকার কারিগরি কর্ম, কৃষি ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য সমাজের জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করে থাকে। এ জনশক্তি যত বেশি দক্ষ হবে সমাজ তত উন্নত হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৫. **অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঃ** সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থাকা সমাজের একটি অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিক ক্রিয়া ব্যতিরেকে সমাজ অচল। ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেন-দেন, ব্যাংক বীমা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সমাজের উপাদানও বটে।

বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি

শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ জীবনে যে সমাজে সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সে সমাজের রূপ সম্পর্কে সে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে। সে কারণে বিদ্যালয়কে সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি বলা হয়। কেননা সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো ক্ষুদ্র অবয়বে ধরা পড়ে বিদ্যালয়ে।

(১) বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থী মিলে একটি জনগোষ্ঠি; এখানে তাদেরকে কতকগুলো নিয়ম ও শৃংখলা মেনে চলতে হয়। সেজন্য এটা একটি সমাজ।

(২) বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন ও সাংবাৎসরিক কর্মকান্ড বিদ্যামান। এ কর্মকান্ডের আওতায় বিদ্যালয়ের সকলে আবদ্ধ সে কারণে এটি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

(৩) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা লেখা-পড়া, খেলাধুলা ও যাবতীয় কর্মকান্ডে পরস্পরে সহাবস্থানে থাকে এবং বিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয় ফলে তাদের মধ্যে সহনশীলতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, আনুগত্য, শৃংখলাবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি গুণাবলী বিকাশ লাভ করে যা তাদের পরবর্তী সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হয়।

বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি

(৪) বিদ্যালয়ে এমন কতকগুলো কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় যাতে শিক্ষার্থীগণ একগোষ্ঠিভুক্ত বলে মনে করে এবং এক অনুভূতির অংশীদার হয়ে উঠে। যেমন- দৈনিক সমাবেশ, জাতীয় সংগীত, বিদ্যালয়ের পোষাক, ইত্যাদি তাদেরকে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও একাত্মতা সৃষ্টিতে সহায়ক ও তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে।

(৫) বিভিন্ন কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাদেরকে গণতান্ত্রিকমনা করে তোলে এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলে।

(৬) খেলাধুলা, শিক্ষা সফর, প্রদর্শনী, হস্ত শিল্পমূলক কর্মসূচি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কলাপ এবং প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন প্রকল্পমূলক কাজ যেমন ফুল বাগান করা, কৃষি ক্ষেত করা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ করে তোলে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে বৃহত্তর সমাজের যোগ্য সদস্য হওয়ার জন্য গড়ে তোলে।

মোটকথা বিদ্যালয় বৃহত্তর জীবনের প্রতিরূপ হিসেবে কাজ করে। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা, অতিথি অভ্যাগতের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ প্রদর্শন, জনস্বার্থের নিয়মনীতি মেনে চলা, বিপদ ও দূর্ঘটনায় সাধ্যমত একে অপরকে সাহায্য করা, সচেতনভাবে নাগরিক দায়িত্ব পালন করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা প্রভৃতি সামাজিক আচরণগুলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা অর্জন করে। সেজন্য বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি বলা হয়।

সামাজিক পরিবর্তন ও প্রগতি

সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ ঘটেই চলেছে। বাংলাদেশও তার থেকে ভিন্ন নয়। জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে সাথে সমাজে জীবন মানের রূপ ও ধারার উৎকর্ষতা ঘটছে, দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে জীবন যাত্রার মান ও জীবন যাপনের প্রক্রিয়া ও প্রণালী, ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের রূপরেখা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির। তাই দেখা যাচ্ছে :

(১) সংস্কৃতির পরিবর্তন ঃ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা, জীবন মানের উপর প্রভাব ফেলে। এ স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে নতুন নতুন জ্ঞান, চিন্তা ও চেতনাকে বিকশিত করে, জীবনযাপনের পথকে খুলে দেয়, সামাজিক আদান প্রদানের রূপরেখা সৃষ্টি করে, আচার অনুষ্ঠানের নিয়ম পদ্ধতি অর্জিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে নবতর ধ্যান ধারণা অর্জন করে ফলে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে।

(২) জীবন যাত্রার পরিবর্তন ঃ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের খাদ্যাভ্যাস, যোগাযোগ কৌশল, ব্যবহার্য জিনিস পত্রের পরিবর্তন ও উদ্ভাবন ইত্যাদি ঘটেই চলেছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম এসব বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। ফলে এ স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে জীবন যাত্রার পদ্ধতি ও জীবন মানের পরিবর্তন ঘটছে।

সামাজিক পরিবর্তন ও প্রগতি

(৩) ব্যবসায়-বাণিজ্যের ধরনের পরিবর্তন ঃ যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে আজ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেই চলেছে। আজ ঘরে বসেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের কোন সংস্থা বা ব্যক্তির সঙ্গে ফোন, মোবাইল ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল ইত্যাদির মাধ্যমে লেনদেন করে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্ভব হচ্ছে। ব্যাংক এর কাজ সহজ ও দ্রুততর হচ্ছে, এক স্থানের শাখায় টাকা জমা দিয়ে অন্য স্থানের শাখা থেকে টাকা তোলা যাচ্ছে (অন লাইন ব্যাংকিং) ইত্যাদি বিষয়গুলো মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে শিখছে। এ ক্ষেত্রেও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) বিশ্বায়ণ চিন্ড়র সৃষ্টি ঃ বর্তমানে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, সামাজিক নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, শিল্প, যোগাযোগ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে স্বীয় দেশের মধ্যে মানুষ আর সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে পারছে না। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সম্পর্ক রেখে ও যৌথভাবে চলতে হচ্ছে। এ ধারণাটাও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে। অর্থাৎ আন্ডর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এবং বিশ্বায়নের ধারণা স্বল্প হলেও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে।

(৫) পরিবেশ এর পরিবর্তন ঃ শিক্ষা ও জীবন যাত্রার উপর পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। আবার শিক্ষা পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়। শিক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে ভৌত পরিবেশ যেমন; রাস্তা-ঘাট, ঘর বাড়ী, যানবাহন, আসবাবপত্র, রান্নার সরঞ্জাম ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি নান্দনিক পরিবেশ - খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন, আনন্দ স্ফুর্তি করার ধরণ, স্বরূপ ও সরঞ্জামাদিরও পরিবর্তন ঘটছে। এভাবে শিক্ষার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

(৬) শ্রমিক শক্তির পরিবর্তন ঃ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ফলে সংস্কৃতি ও জীবন যাত্রার পরিবর্তন, শিল্প ও বাণিজ্যের স্বরূপের পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রমের স্বরূপের পরিবতর্নও হচ্ছে। কায়িক পরিশ্রমে যে কাজ পূর্বে করা হত বর্তমানে সে সব যান্ত্রিক কৌশলে করা হচ্ছে। ফলে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্র পরিচালনা কৌশল শিখতে হচ্ছে।

শিক্ষা প্রগতিশীল, এটা এক স্থানে থেমে থাকে না। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতি, জীবন মান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সবই পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল। যুগের সভ্যতার মাপকাঠিও শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা যেমন মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সামাজিক পরিবর্তনও ঘটিয়ে চলেছে।

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রতিষ্ঠিত। সমাজের প্রয়োজনে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়

এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। অতএব বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা বিদ্যমান। যেমন :

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা

(ক) শিক্ষার্থীর বিকাশে বিদ্যালয় ও সমাজের নিবিড়তা :

শিক্ষাবিদ জন ডিউই বলেছেন: শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা। তাঁর কাছে জীবন ও শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সমাজের প্রয়োজনে বিদ্যালয় সৃষ্টি। সুতরাং সমাজের উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয় কাজ করবে। এটাই কাঙ্খিত ও স্বাভাবিক। সমাজ চায় তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে আর একাজ করে বিদ্যালয়।

শিশু সমাজের একজন সদস্য এবং বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী সুতরাং শিক্ষার্থীর সুষম বিকাশের জন্য বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও হৃদ্যতাপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। কেননা উভয়ের সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষার্থীর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে মার্জিত আচরণ শিক্ষা লাভ করে। ঐ আচরণ ও অভ্যাসগুলো স্থায়ী হওয়ার জন্য অনুকুল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন। আবার বাড়ি ও সমাজ থেকে অর্জিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রীতিনীতি বিদ্যালয়ে অনুকুল পরিবেশ না পেলে স্থায়ীত্ব লাভ করে না। অতএব, বিদ্যালয় ও সমাজ সর্ম্পকযুক্ত ও একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

(খ) বয়ঃসন্ধিকাল নিয়ন্ত্রণ ঃ

শিক্ষার্থীর বিকাশের ক্ষেত্রে বয়:সন্ধিকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বয়:সন্ধিকালের নিয়ন্ত্রণের উপর সমাজের বেশ কিছু শৃংখলা নির্ভর করে, তাদের সুঅভ্যাস গঠন ও মার্জিত আচরণ অনুশীলন নির্ভর করে এবং ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সময় তাদের সঠিকভাবে পরিচালনা করা ও নির্দেশনা দান করা অত্যন্ত জরুরী। আর এ কাজটির বৃহত্তর অংশ করে থাকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সমাজও এ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে লালন করে।

(গ) সমাজের চাহিদাপূরণে বিদ্যালয় ঃ

বিদ্যালয় সমাজের প্রয়োজনে একটি সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে এর এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আদি যুগে যখন সমাজের কোন সুস্পষ্ট রূপ ছিল না তখন আধুনিক বিদ্যালয়ের সুস্পষ্ট রূপ ধরা পড়েনি। তারপর সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নানা ধরনের বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। বিদ্যালয় তার পারিপার্শ্বিক সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সমাজ চায় বিদ্যালয় তার চাহিদা পূরণ করবে। তার চাহিদা পূরণের জন্য

বিদ্যালয়ের গঠন, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সবকিছুই সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কী হবে তাও সমাজ নির্ধারণ করে দেবে। শিক্ষা ব্যক্তির কতখানি প্রয়োজন মেটাবে, সমাজের স্বার্থ কতখানি সংরক্ষণ করবে এবং ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের কতখানি সমন্বয় সাধন করবে এ সব কিছু নির্ধারণ করবে সমাজ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের ফলে সভ্যতার বিকাশ ঘটছে ফলে সমাজের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, বিষয়বস্তু, শিক্ষাদান পদ্ধতিও সমাজ সংগঠনের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে।

(ঘ) বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণ সামাজিক ও বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপের যৌথ অংশগ্রহণ ঃ

বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন সামাজিক আচার আনুষ্ঠানিক, সমাজসেবা মূলক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারেন ও করে থাকেন। অনুরূপভাবে সমাজের ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবকবৃন্দ বিদ্যালয়ের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, প্রদর্শনী, প্রভৃতি ও বিদ্যালয় পরিচালনা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন। এভাবে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং পরিবর্তনশীল সমাজে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মূল্যায়নঃ

১. 'বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি' - উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

২. বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে যে সকল প্রত্যয় কাজ করছে তার একটি বিবরণ দিন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও গ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-খ

১. বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই কতকগুলো নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়।

২. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা লেখা-পড়া, খেলাধূলা ইত্যাদি কর্মকান্ডে পরস্পর সহ অবস্থান করে।
৩. শিক্ষার্থীদের শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণ তাদেরকে গণতান্ত্রিক মনা করে তোলে।

ইউনিট-৫ অধিবেশন-৫

গণশিক্ষায় ভূমিকা

ভূমিকা

শিক্ষা সকল মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষিত ব্যক্তি দেশ ও জাতির মূল্যবান সম্পদ। অন্যদিকে নিরক্ষর ব্যক্তি দেশ ও জাতির বোঝাস্বরূপ। তাই দেশে দেশে এই নিরক্ষণ ব্যক্তিদের সাক্ষরতা ও শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত করার যে আয়োজন তাই গণশিক্ষা। গণশিক্ষায় একদিকে যেমন অন্তর্ভুক্ত করা হয় সাক্ষরতা ও সচেতনতা শিক্ষা তেমনি অন্তর্ভুক্ত করা হয় পেশাগত দক্ষতা ও উন্নয়ন শিক্ষা। যাতে তাঁরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে নিয়োজিত হতে পারে। তাই গণশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। গণশিক্ষা কর্মসূচিতে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- গণশিক্ষা কি এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- গণশিক্ষার গুরুত্ব , গণশিক্ষা কার্যক্রম ও গণশিক্ষায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব ক ঃ গণশিক্ষা কি ও এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সাধারণ অর্থে নিরক্ষর জনগণের জন্য সাক্ষরতা ও শিক্ষার যেসব আয়োজন তাই হল গণশিক্ষা। এর অন্যতম লক্ষ্য হল নিরক্ষর জনগণকে পড়া, লেখা ও হিসাব নিকাশ শেখানো। তাছাড়া শিক্ষা লাভের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

প্রিয় শিক্ষার্থী আপনার মতে গণশিক্ষার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে এরূপ ৫টি উদ্দেশ্য নিম্নের ছকে লিখুন।

১.
২.
৩.

৪.
৫.

পর্ব-খঃ গণশিক্ষার গুরুত্ব, গণশিক্ষা কার্যক্রম ও গণশিক্ষায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা

বাংলাদেশে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে নিরক্ষর লোককে সাক্ষরজ্ঞান দানের জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ কার্যক্রমের ফলে গত দুই দশকে বয়স্ক সাক্ষরতার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও মোট নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ বয়স্ক নিরক্ষর রয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে ভর্তি উপযোগী শিশু স্কুলে ভর্তি হতে না পারা, ভর্তিকৃত শিশু পঞ্চম শ্রেণী শেষ করার আগেই ঝড়ে পড়ার ফলে নিরক্ষর নারী-পুরুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। নিরক্ষর এসব লোক অদৃষ্টবাদিতা ও কুসংস্কার-এ জড়িয়ে পড়ে। জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাই দেশে বিরাজমান ভয়াবহ নিরক্ষরতা দূর করতে হলে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা অপরিহার্য।

সরকার ১৯৮০ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তৎমধ্যে "সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (১৯৮০)", প্রতি জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (গণশিক্ষা) এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক গণশিক্ষা সংগঠক নিয়োগ (১৯৮০), 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ' প্রতিষ্ঠা, বয়স্ক শিক্ষা এবং অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম (২০০২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত কর্ম বাস্তবায়নে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত বিদ্যালয়ও গণশিক্ষার কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, গণশিক্ষায় বিদ্যালয় কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে নিম্নের ছকে 'কী (Key) পয়েন্ট' এর মাধ্যমে লিখুন।

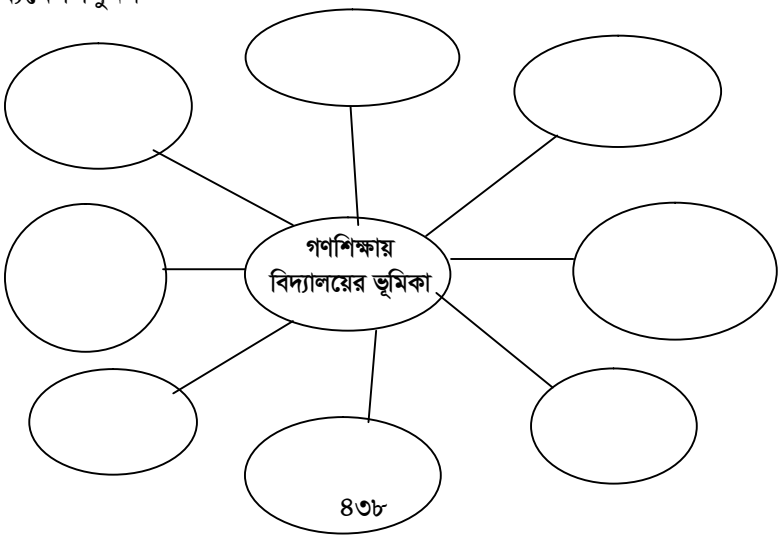

ইউনিট-৫ অধিবেশন-৫

মূল শিখনীয় বিষয়

গণশিক্ষায় ভূমিকা

গণশিক্ষা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। গণশিক্ষা তথা শিক্ষার একটি অংগ। বাংলাদেশের জনসংখ্যা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গণশিক্ষা প্রচলন অনস্বীকার্য। শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন দেশ ও জাতির কাছে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় নিরক্ষর ব্যক্তি ঠিক তার বিপরীত। সে জাতির জন্য বোঝা স্বরূপ এবং ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, মানবতা ও সভ্যতার জন্য কোন প্রকার অবদান রাখতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে গণশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ অর্থে গণমানুষের জন্য সাক্ষরতা ও শিক্ষার যে আয়োজন তাই গণশিক্ষা। নিরক্ষর শিশুকিশোর ও বয়স্ক মানুষের জন্য চাহিদা ভিত্তিক, ব্যবহারিক এবং স্বল্প সময়ে অল্প খরচে পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাই গণশিক্ষা।

গণশিক্ষা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তাছাড়া গণশিক্ষা বলতে বোঝায় বিভিন্ন বয়সের জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত নানা ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী। সাক্ষরতা গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রধান কর্মসূচী হলেও গণশিক্ষার পরিসর বিস্তৃত। গণশিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে লোকজনকে নানা ভাবে সক্ষম করার প্রচেষ্টা নেয়া হয় যাতে তারা বুঝতে, চিন্তা করতে শেখে, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার, মানুষের অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। গণশিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে গরীব ও বিচ্ছিন্ন লোকজনকে সংগঠিত করা যায়। যাতে সংঘবদ্ধ শক্তির দ্বারা তারা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত হতে পারে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। গণশিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে প্রজ্ঞা, সৃজনশীল, সহনশীলতা এবং অন্যান্য মানবীয় গুন অর্জনে সহায়তা করা।

২। গণশিক্ষা দ্বারা নিরক্ষর জনগণকে শ্রমশীল, কর্মদক্ষ ও উৎপাদন মুখী কর্মে উদ্বুদ্ধ করা।

৩। নিরক্ষর জনগণকে নিজেদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানো।

৪। গণশিক্ষার মাধ্যমে যে কোন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা।

৫। নিরক্ষর জনগণকে গতিশীল পৃথিবীর সাথে পরিচয় করে দেয়া ও নিজেদের বিবেক বুদ্ধির সৃষ্টি করা।

৬। সমাজে নিরক্ষরদের মধ্যে অনেক মেধাবি ব্যক্তি রয়েছেন যারা জীবনে পড়াশুনার সুযোগ হতে বঞ্চিত। সাক্ষর জ্ঞান লাভের সংগে সংগে তাদের মধ্যে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে দেশের যথার্থ সম্পদে পরিণত করা।

৭। জনগণকে গণশিক্ষার মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্ম প্রচেষ্টা চালানোর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা। কৃষি উন্নয়ন, শিল্পকাজে নৈপুনতা অর্জন, সমাজ কল্যাণে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের সাথে সুখী জীবন যাপন করতে সাহায্য করা।

গণশিক্ষায় একদিকে যেমন অন্তভুক্ত হয়েছে সাক্ষরতা ও সচেতনতা শিক্ষা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে পেশাগত দক্ষতা ও উন্নয়ন শিক্ষা। শিক্ষার্থীর বয়স ও শিখন বিষয়কে ভিত্তি করে গণশিক্ষার দুটি ধারা গড়ে উঠেছে।

গণশিক্ষা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ব্রিটেনে Further Education, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ায় Adult Education, ফ্রান্সে Popular Education. গণশিক্ষার উদ্দেশ্যে পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী বিশ্বের বিভিন্নদেশে বিভিন্ন রকম। বাংলাদেশে গণশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৮০ সাল একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর, কেননা এ সাল থেকেই সারাদেশে "স্বাক্ষরতা" অভিযান শুরু হয়। গ্রহণ করা হয় "সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম নামের প্রকল্প"। এ জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। যাতে এক বৎসরেই ১১-৪৫ বৎসর বয়সের ১ কোটি নিরক্ষর লোককে স্বাক্ষর করে তোলা যায়।

গণশিক্ষায় সরকারী কার্যক্রম

১৯৮১ সালের শেষ দিকে প্রত্যেক জেলায় ১ জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (গণশিক্ষা) নিয়োগ ছাড়াও প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন গণশিক্ষা সংগঠক নিয়োগ করা হয়।

১৯৮২ সালের প্রথম দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কর্মসূচী মূল্যায়নের জন্য "গণশিক্ষা মূল্যায়ন কমিটি" গঠন করেন। গণশিক্ষা কর্মসূচীতে তিনটি বই, লেখাপড়ার জন্য বড়দের বই, বর্ণপরিচয়, স্বাক্ষরতা শিক্ষা দান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু "গণশিক্ষা মূল্যায়ন

কমিটি" কাজ শেষ হবার আগেই সরকার গণশিক্ষা কর্মসূচী মূলতবী করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যে অনুযায়ী কর্মসূচীর সকল তৎপরতা বন্ধ করে দেয়।

পরবর্তী সময়ে সরকার গণশিক্ষা কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিতকরণের এক ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ''প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ" নামে একটি পৃথক বিভাগ গঠিত হয়েছে এবং গণশিক্ষা কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য "উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া এ উদ্দেশ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০০) গণশিক্ষা বিস্তারের এক ব্যাপক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিম্নরূপ-

লক্ষ্য

- বয়স্ক সাক্ষরতার হার ২০০২ সালে ৮০ শতাংশ উন্নীত করা।
- শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত ও নেতৃত্বের দক্ষতা প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতা, সংখ্যার ধারণা এবং যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।
- নব্য সাক্ষরদের জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অঞ্চল ভিত্তিক বৈষম্য দূরীভূত করা।

ধারা

শিক্ষার্থীর বয়স ও শিখন বিষয়কে ভিত্তি করে গণশিক্ষার দুটি প্রধান ধারা গড়ে উঠেছে- (১) উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং (২) বয়স্ক শিক্ষা। এছাড়াও অব্যাহত শিক্ষা নামে গণশিক্ষার আরেকটি ধারা বর্তমানে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা : আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বহির্ভূত বা ভর্তি হয়েও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে এমন সব বঞ্চিত শিশু কিশোরদের জন্য এই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হয়। এটি মূল ধারার প্রাথমিক শিক্ষার একটি পরিপূরক ব্যবস্থা। এ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরক্ষর শিশু কিশোরদের মৌলিক শিক্ষা প্রদান। এছাড়া এদেরকে কিছু কিছু দক্ষতা ও সচেতনতা শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণত ১১-১৪ বছর বয়সের জনগোষ্ঠী হল এর লক্ষ দল।

বয়স্ক শিক্ষা : পনের বা তদুধর্ষ্ব বয়সের সকল নিরক্ষর নারী পুরুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গণশিক্ষার অধীনে এই বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার অধীনে তিন ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়। এগুলো হল - (১) সাক্ষরতা শিক্ষা, (২) সচেতনতা শিক্ষা এবং (৩) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের শিক্ষা।

অব্যাহত শিক্ষা : বর্তমানে গণশিক্ষার এই ধারাটি গড়ে উঠেছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির (যাদের নিয়মিত শিক্ষা চর্চার সুযোগ নেই) অর্জিত দক্ষতাকে অটুট রাখা এবং শক্তিশালীকরণের জন্য এ ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে গ্রামে গঞ্জে অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠ অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। ফলে নব্য সাক্ষরদের পুনরায় নিরক্ষর হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। এছাড়া সব কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে জন মানুষের পাঠের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

গণশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ''প্রাথমিক ও গণশিক্ষা" বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকীকরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ''উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর''। সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, ক্লাব, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তকরণের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। দেশের গণমাধ্যমগুলোও (রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র) সরকারের এই গনশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের শিক্ষা বাজেটের প্রায় ৫০ ভাগ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে ব্যয়িত হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে "প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদ"।

গণশিক্ষার গুরুত্ব ও গণশিক্ষায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন বয়স্ক শিক্ষা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার ঘটায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। স্বাধীনতার পর এদেশের মোট জনসংখ্যা যা ছিল এখন শুধু নিরক্ষর জনসংখ্যাই তার কাছাকাছি। পুরুষদের চেয়ে নারীদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার অনেক কম। আবার শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে নিরক্ষরতা বেশী। এখন দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তার অপ্রতুলতা, অনমনীয়তা ও অব্যবস্থাপনার কারণে অনেক মানুষ শিক্ষার আওতায় আসতে পারছে না। তাই নিরক্ষর নারী-পুরুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। নিরক্ষরতার ফলে অদৃষ্টবাদিতা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা সমগ্র জাতিকে গ্রাস করছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারছেনা। জনগণের দ্বারে স্বাধীনতার সুফল পৌছাচ্ছে না। তাই দেশে বিরাজমান ভয়াবহতা নিরক্ষতা দূর করার জন্য গণশিক্ষা অর্থাৎ একাধারে বয়স্ক শিক্ষা এবং যে সব শিশু শিক্ষার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইবে থেকে যাচ্ছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য। তাছাড়া কুসংস্কার ও ভাগ্য নির্ভরতা থেকে মুক্ত আত্মপ্রত্যয়ী সমাজ মনস্ক অসম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্দীপ্ত মানুষ গড়ে তোলার জন্য এবং হিসাব-নিকাশে দক্ষতার পাশাপাশি গণতন্ত্র, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও স্থিতিশীল জীবন মুখী সচেতন মানুষ গড়ে তোলার জন্য গণশিক্ষা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

বিদ্যালয় গ্রামের বা সমাজের লোকজনের শিখন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। বিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকায় তারা বিভিন্ন ক্লাব বা সমিতির উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করতে পারেন। সেখানে জনসাধারন খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রিকা পড়তে পারেন, রেডিও ও টেলিভিশনে গণশিক্ষার আসর পরিচালিত হয়, তা রেডিও তে শুনতে পারবেন এবং টিভিতে দেখতে পারবেন। তাছাড়া বিদ্যালয়ে গণশিক্ষার উপর সেমিনার ও আলোচনা সভারও আয়োজন করা যেতে পারে। TLM (Total Literacy Movement) বা সার্বিক স্বাক্ষরতা কর্মসূচীর আওতায় সরকার যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছে এগুলো বাস্ড়বায়নে বিদ্যালয় গুলো জনসংযোগ অব্যাহত রেখে এবং বিভিন্ন উদ্বুদ্ধ করণ কর্মসূচী চালিয়ে যেতে পারে। বিদ্যালয়ের পক্ষে শিক্ষকবৃন্দ যথার্থ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করবে। স্বাক্ষরতা

বিস্ড়ারে বা গণশিক্ষায় শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যাপক রবার্ট ইউলিক বলেছেন "শিক্ষা সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারার বাহক নতুন ভাষ্যকার, নির্বাচিত প্রতিনিধি, জাতীয় চেতনার সঞ্চারক ও উদ্ভোধক"

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অর্মত্যসেনের মতে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে নিরক্ষর রেখে উন্নতি কোন ভাবেই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এটি অধিকতর প্রযোজ্য। তাই অল্প সময়ে দেশকে নিরক্ষরতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেশের মানুষকে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হলে গণশিক্ষা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।

মূল্যায়নঃ

১. গণশিক্ষা বলতে কী বোঝায়? গণশিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো কী? গণশিক্ষা কার্যক্রমে সরকারের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

২. গণশিক্ষার গুরুত্ব ও গণশিক্ষায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও খ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৫ অধিবেশন-৬

সমাজ বিকাশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা

ভূমিকা

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংক্ষরণ হিসাবে চিহ্নিত। এখানেই শিশু প্রথম বারের মত পাঠ নিতে আসে। কাজেই শিশুর শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। তবে শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব এককভাবে বিদ্যালয় বা সমাজের পক্ষে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। উভয়েরই মাঝে সহযোগিতার প্রয়োজন। বিদ্যালয় একদিকে যেমন সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষা কর্মকান্ড পরিচালনা করে তেমনি অন্যদিকে সমাজেরও কর্তব্য বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে বিভিন্নভাবে বিদ্যালয়কে সহযোগিতা প্রদান করা। শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে বিদ্যালয় পারস্পরিক সহযোগিতার আদান প্রদানের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে সমাজ বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- পরিবেশ সংরক্ষণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- কর্মভিত্তিক কার্যে উদ্বুদ্ধকরণ ও পুষ্টিজ্ঞানে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিদ্যালয়ের করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে, নিরক্ষরতা দূরীকরণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়কে সমাজের মিলনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে স্থানীয় সামাজিক সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক ঃ পরিবেশ সংরক্ষণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়ের একটি তালিকা নিম্নের ছকে লিখুন।

ক্রমিক নং	পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়
১	
২	
৩	
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	

পর্ব-খঃ কর্মভিত্তিক কার্যে উদ্বুদ্ধকরণ ও পুষ্টিজ্ঞানের সচেতনতা বৃদ্ধিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের করণীয়

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে কর্মভিত্তিক কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর উপাদান ও পুষ্টিমান সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যার থেকে এ স্তরের শিক্ষার্থীরা কর্মভিত্তিক কার্যে উদ্বুদ্ধকরণের প্রক্রিয়া, খাদ্যবস্তুর উপাদান এবং এগুলোর পুষ্টিমান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আমাদের দেশে বিশেষত গ্রামে বসবাসকারী লোকের কর্মভিত্তিক কার্যে সচেতনতার অভাব এবং পুষ্টি জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা এ ব্যাপারে জনসাধারণকে সচেতন করতে পারে।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, কর্মভিত্তিক কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ ও পুষ্টিজ্ঞানে সচেতনতা বৃদ্ধিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় কী কী ভূমিকা নিতে পারে 'কী (Key) পয়েন্ট' এর মাধ্যমে নিম্নের ছকে লিখুন।

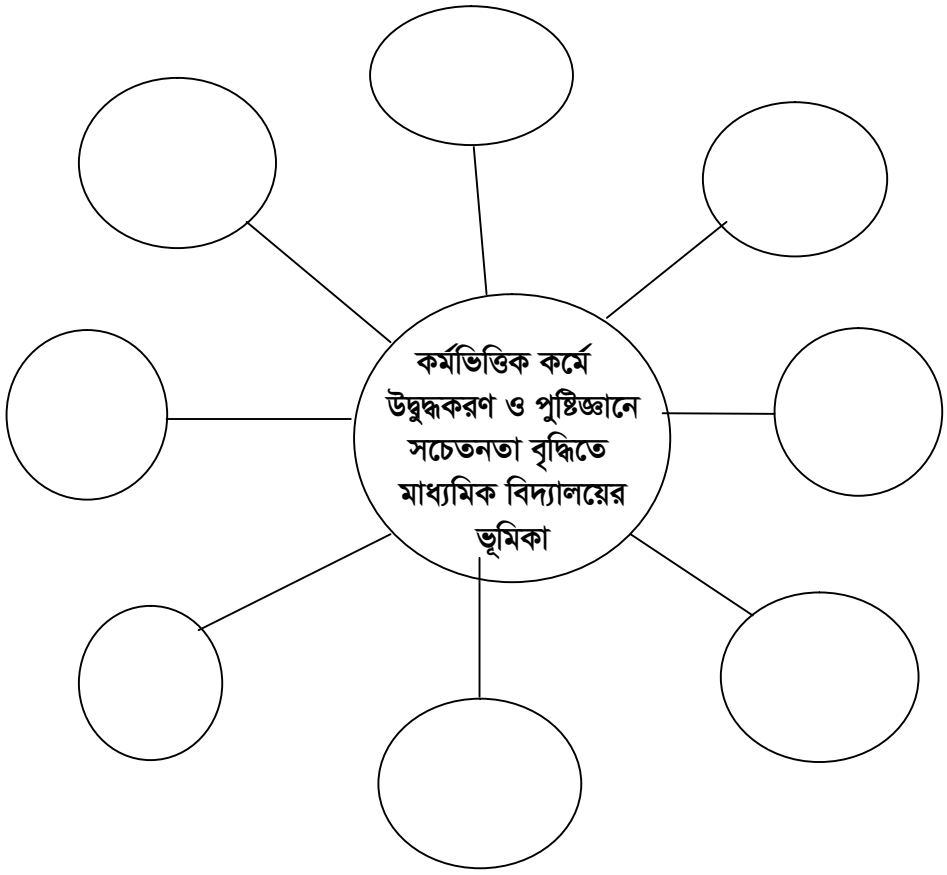

পর্ব-গঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্থানীয় সামাজিক সমস্যার সমাধান ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, মূল শিখনীয় বিষয়-এ উল্লিখিত জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয়ের ভূমিকা শীর্ষক অংশটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং নিম্নের ছকে ঐ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন নিম্নের ছকে লিখুন।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নঃ

জ্ঞানমূলক	
অনুধাবনমূলক	
প্রয়োগমূলক	
উচ্চতর চিন্তন দক্ষতামূলক	

ইউনিট-৫ অধিবেশন-৬

মূল শিখনীয় বিষয়

সমাজ বিকাশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা

বিদ্যালয় বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান সহজে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিদ্যালয় গৃহ ও চত্বর, ছাত্রাবাস, বিদ্যালয়ের আশপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। শিক্ষার্থীরা পরিকল্পনা মাফিক সপ্তাহে একদিন বিদ্যালয় ও আশপাশের আগাছা কেটে ফেলা, নর্দমা ও খাল পরিস্কার করা, বিদ্যালয় চত্তরে বা আশেপাশের মজা পুকুর পরিস্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক তারা মাসে একদিন বা বছরে কয়েকদিন গ্রামে বেরিয়ে পড়তে পারে এবং গ্রামের লোকদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। তারা গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা অভিযান কাজে সহযোগীতা করতে পারে। এভাবে তারা গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিয়ম কানুনগুলো শিখতে এবং সাধারণ রোগ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করতে সহযোগিতা করতে পারে।

গ্রামের লোকেরা অপরিস্কার ও দূষিত পানি ব্যবহার করে রোগগ্রস্থ হয়। তাদের সে সম্পর্কেও জ্ঞান দিতে পারে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সাধারণ নিয়মকানুন ও স্বাস্থ্য বিধি পালন করা বিষয়ে শিক্ষাদান এবং এ সকল কার্যক্রম দ্বারা কিরূপে ছোট মেয়েদের সাধারণ রোগের হাত থেকে বাঁচান যায় সে শিক্ষাও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গ্রামবাসীদের দিতে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষণে বিদ্যালয়

প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজন মেটাতে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে বন জংগলের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এতদসত্ত্বেও গ্রামে গাছপালা নির্বিচারে কাটা হচ্ছে। ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে এবং দেশ ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এ অবস্থার প্রতিরোধ করা একান্তভাবে আবশ্যক। এ জন্য দেশের সর্বত্র বিশেষ করে বিদ্যালয় ও বাড়ির আশপাশ, রাস্তার দু'ধারে এবং পতিত জায়গায় গাছপালা লাগান দরকার।

প্রতি বছর সরকার পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করা হয় কিন্তু কাম্য সুফল পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে বিদ্যালয় চত্বরে গাছ লাগাবেন। তাছাড়া গ্রামে বাড়ী বাড়ী ঘুরে জনসাধারণকে নির্বিচারে গাছ কাটার কুফল এবং গাছ লাগানোর সুফল সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। গাছপালা আমাদের খাদ্য, ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্রের কাঠ, জ্বালানী সরবরাহ করে এবং আরও বহু উপায়ে আমাদের উপকারে আসে। এ সকল কথা বুঝতে পারলেই লোক স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে গাছ লাগাবে।

বিদ্যালয় চত্বরে শাক সব্জি ও ফলের বাগান করা যেতে পারে। এ বাগানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিজেরা কাজ করবেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। এ সকল ফলমুল ও শাক-সব্জি চাষের দ্বারা কৃষি সম্পর্কিত আবশ্যকীয় ব্যবহারিক ও বাস্তব জ্ঞান লাভ ছাড়াও এদের পুষ্টিগত মূল্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। এ সকল কাজে শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারলে তারা স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে বাড়ির আশে পাশে খালি জায়গায় ফলমূল ও শাক-সব্জির চাষ করতে পারবে।

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মৌসুমে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামে বেরিয়ে পড়তে পারে। তারা গ্রামে গিয়ে লোকজনদের ফলের গাছ লাগান ও শাক-সব্জি চাষের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারে।

কর্মভিত্তিক কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ

আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে এখনও বিষয় কেন্দ্রিক কেতাবী শিক্ষার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তাই শিক্ষিত লোকেরা শ্রমের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। শিক্ষার সাথে জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগাতে হলে কর্মমূখী-শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। কর্মমুখী শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ঘটে এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আমাদের বিদ্যালয়ে চারু ও কারুকলা শিক্ষণীয় বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়গুলো যথাযথ গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দেয়া উচিত। বিদ্যালয়ে দর্জির কাজ, কাঠের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, তাঁতের কাজ, পাটের কাজ, লোহার কাজ, ঘড়ি, কলম রেডিও এবং টেলিভিশন মেরামতের কাজ, সাবান তৈরি,

নারিকেলের ছোবড়া থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরি, ইট তৈরি, গাড়ী মেরামত, আসবাবপত্র তৈরি, কালাই ও টিনের কাজ ইত্যাদি শিল্প শিক্ষা দেয়া যায়।

আমাদের সরকার গ্রামের কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কুম্যুনিটি স্কুলে রূপান্তরিত করেছেন। ঐ স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের কোন শিল্প বিষয়ক ট্রেডে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা আছে। শুধু শিক্ষার্থীরাই নয় গ্রামের লোকেরাও অবসর সময়ে ঐ শিল্পের উপর কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের লোকজনের একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে।

পুষ্টি সচেতনতায় বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর উপাদান ও পুষ্টিমান সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। গ্রামের লোকেরা অনেক সময় খাদ্যের অভাবে নয়, পুষ্টি জ্ঞানের অভাবে রোগগ্রস্থ হয়। ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে শিশুরা অন্ধ হয়ে যায়-এ জ্ঞান না থাকায় অনেক অভিভাবক তাদের শিশুকে অন্ধত্বের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন না। অনেক ফলমূল ও শাক-সবজিতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ আছে সে কথা অনেকে জানেনা। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামের কৃষকদের বাড়ীতে গিয়ে পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান দিতে পারে। সঠিক রন্ধন প্রণালী না জানায় অনেক মূল্যবান খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। সে সম্পর্কে মহিলাদের জ্ঞান দান করা আবশ্যক। তাছাড়া গ্রামের লোকদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে খাদ্যের ব্যাপারে নানা কুসংস্কার আছে। স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টির জন্য ঐগুলো দূর করা আবশ্যক। বিদ্যালয় এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা অথচ এখানে তেমন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। দারিদ্র, নিরক্ষরতা, কর্ম সংস্থানের অভাব প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের জন জীবন বিপর্যস্ত। তাছাড়া জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে জনসংখ্যা পরিকল্পনা করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এটা গ্রামের লোকেরা উপলব্ধি করতে পারে না। বিদ্যালয়ও এ ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

নিরক্ষরতা আজকের দিনে উন্নয়নের একটা বড় রকমের প্রতিবন্ধক। নিরক্ষরতা একটা সামাজিক অভিশাপও। নিরক্ষরতা মানুষকে তার স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধার সৃষ্টি করে। জাতীয় আয় ও সম্পদের নিরিখে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান হয়েছে দরিদ্রতম ও সব চেয়ে কম উন্নয়নশীল দেশসমূহের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আমাদের দেশে প্রায় ৭০% লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও জাতীয় আয়ের একটা নিকট সম্পর্ক দেখা যায়। শিক্ষিত চাষীর জমিতে উৎপাদনের হার অধিক। শিক্ষিত শ্রমিক অশিক্ষিত শ্রমিকের চেয়ে অধিক উৎপাদন করে থাকে। শিক্ষার প্রসার ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভবপর নয়।

বিদ্যালয় তার পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কর্মসূচি হিসাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অংশ নিতে পারে। বিদ্যালয়ের আশপাশের বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা একটা কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া জরুরী কর্মসূচি গ্রহণ করে ছুটির সময় শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিবেশী নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তুলতে পারে। এ জাতীয় কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নের একটা বুনিয়াদ তৈরি করা যায়। বিদ্যালয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে।

সামাজিক সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয়

বিদ্যালয় ঐ এলাকার লোকজনদের মিলনকেন্দ্র হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। গ্রামের লোকেরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ক্লাব বা সমিতি গঠন করতে পারেন। তাঁরা বিদ্যালয়ের একটা কক্ষ তাঁদের মিলনকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। সেখানে তারা সন্ধ্যার পর বা অবসর সময়ে একত্রিত হয়ে নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে তা দূরীকরণে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষ জ্ঞান থাকায় তাঁরা বিভিন্ন ক্লাব বা সমিতির উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করতে পারেন। ঐ সকল ক্লাব বা সমিতির সদস্যবৃন্দ নিছক অবসর বিনোদনের জন্যও ক্লাবে জমায়েত হতে পারেন। সেখানে খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রিকা পড়তে পারেন, রেডিও শুনতে পারেন, টেলিভিশন দেখতে পারেন কিংবা খেলাধুলা করতে পারেন। গ্রামের লোকেরা অনেকে নিছক হাসি তামাশা ও গাল-গল্প করে অনেক সময় নষ্ট করেন। তাঁরা যদি ঐ ক্লাব বা সমিতির সদস্য হন তা হলে উপযুক্তভাবে সময় কাটানোর সুযোগ লাভ করতে পারেন। ঐ সকল ক্লাব বা সমিতির

উদ্যোগে নানা বিষয়ের উপর সেমিনার, আলোচনা সভার ব্যবস্থাও থাকতে পারে। বিভিন্ন পেশার ক্লাবগুলো তাদের পেশা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর মাঝে মাঝে আলোচনা সভায় মিলিত হতে পারেন। যেমন কৃষকেরা কৃত্রিম বা রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রণালী, উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, কীটপতঙ্গ দমন ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ডাকতে পারেন। এভাবে বিদ্যালয় এলাকার সকল লোকের জন্য মিলনকেন্দ্র হিসাবে মূল্যবান অবদান রাখতে পারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমাদের গণমানুষকে আত্মকর্ম সংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে, অসামাজিক কাজের কুফল সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, যৌতুক প্রথা নিরসন করে ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করে, দুযোর্গ মোকাবেলায় সহযোগিতা করে এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

মূল্যায়নঃ

১. সমাজ বিকাশে বিদ্যালয় কীরূপ ভূমিকা রাখতে পারে - তা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক

পরিবেশ সংরক্ষণ উপায়ের তালিকা

১. বিদ্যালয়ের আশপাশ পরিস্কার করে
২. গ্রামের লোকদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় সচেতন করে
৩. গ্রামের লোকদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের জন্য সচেতন করে
৪. বিদ্যালয় চত্বরে বৃক্ষরোপণ করে
৫. রাস্ড়ার দুই ধারে গাছ লাগিয়ে
৬. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশগ্রহণ করে
৭. নির্বিচারে গাছ না কেটে
৮. গ্রামের লোকদের বৃক্ষরোপণে সহায়তা করে।

পর্ব-খ ও গ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. *শিক্ষা মনোবিজ্ঞান পরিচিতি (EDB-1302)*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

২. *শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি*, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩. *শিক্ষাশ্রয়ী মনেবিজ্ঞান*, অরুণ ঘোষ, এডুকেশন এন্টারপ্রাইজার্স, কলিকাতা।

৪. *শিক্ষার মনস্তাত্বিক ভিত্তি ও শিক্ষা নির্দেশনা*, মুজিবর রহমান ও স্বপন কুমার ঢালী, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা।

৫. ***শিক্ষাক্রম উন্নয়ন : নীতি ও পদ্ধতি,*** ড. মোঃ আবুল এহসান, ১৯৯৭, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী।

৬. ***মাধ্যমিক শিক্ষা,*** ড. দেলওয়ার হোসাইন শেখ কর্তৃক সম্পাদিত, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০০।

৭. ***শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন,*** **ড.** এম এ ওহাব মিয়া, বাংলা একাডেমী, ২০০৪, ঢাকা।

৮. ***Curriculum Process,*** Dr. Siddiqur Rahman, 1987, Bishaw arichaya, 37 Bangla Bazar, Dhaka

৯. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (১৯৯৫), ঢাকা, মাধ্যমিক স্তর (নবম-দশম শ্রেণী), রিপোর্ট ২য় খন্ড।

১০. রিপোর্ট, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী (নবব-দশম শ্রেণী), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ১৯৯৫

১১. একমুখী শিক্ষাক্রম ২০০৫ (পরিমার্জিত), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম শাখা, ২০০৪

১২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, মাধ্যমিক স্তর (নবম-দশম শ্রেণী) রিপোর্ট ২য় খন্ড, এনসিটিবি, ১৯৯৫